IslamHouse.com

ইসলামের সমালোচনা ও তার জবাব

সায়ীদ ইসমাঈল

‘উদ্দেশ্যপূর্ণ ও উদ্দেশ্যহীন প্রচলিত নিরেট ভ্রান্তিবিলাসের অন্যতম হলো, মানুষের সসীম ও সীমিত বোধশক্তিতে নির্ভর করে অসীম জ্ঞানী আল্লাহর প্রণীত আইন ও বিচারের প্রামাণ্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা। অথচ মানুষের শ্রবণ, দর্শন ও

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্র ব্যবহারের পরও আমাদের আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক জীবনের অনেক কিছুই বুঝতে অক্ষম’। এই গ্রন্থে আকীদা, ইবাদত, আইন, মানবাধিকার, ইসলাম-প্রচার, উগ্রবাদ-চরমপন্থা ও নারীর মর্যাদা-অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে ইসলামের অবস্থান এবং উগ্রবাদের অর্থ ও ইসলামী শরীয়াকে কেন্দ্র করে উত্থাপিত ইসলামের নানা

সমালোচনার যুক্তিপূর্ণ জবাব প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি যৌক্তিক উপায়ে ইসলামের সামষ্টিক বিষয়সমূহের পরিচয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

https://islamhouse.com/৪০১৭১০

- ইসলামের সমালোচনা ও তার জবাব
    - ভূমিকা
    - আকীদা, ইবাদাত ও আইনের সমষ্টির নাম ইসলাম

- ইসলামী শরী‘আ ও বাস্তবতার সম্পর্ক
- ইসলামে মানবাধিকার
  - ইসলামে ইনসাফ ও সমতার অর্থ
  - ইসলামে স্বাধীনতার অর্থ
  - নাগরিকের বাক স্বাধীনতা
  - ইসলামে দাসত্ব বলতে কী বুঝায়?
  - রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে ইসলাম
  - জাতীয়তা ও ধর্মে বিভিন্নতা সম্পর্কে ইসলাম কী বলে?
- ইসলামে মানবিক সম্পর্ক

        - এ থকেে আমরা দু’টি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা বুঝতে পারি:
        - আন্তধর্ম সংলাপ বিষয়ে ইসলামের অবস্থান
        - মানবাধিকার সংগঠনগুলো সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান
    - কল্যাণ প্রচারে আগ্রহ
        - মুসলিমরা ইসলাম প্রচারে আগ্রহী কেন?
        - ইসলামী রাষ্ট্রে অন্য ধর্মের তৎপরতা নিষিদ্ধ কেন?
    - সৌদি আরবে অন্য ধর্মের প্রকাশ্য চর্চা নিষিদ্ধ কেন?

- ইসলাম সন্ত্রাস ও উগ্রতাকে প্রত্যাখ্যান করে
  - আত্মরক্ষামূলক এবং আক্রমণাত্মক ভীতিপ্রদর্শনের মধ্যে পার্থক্য করবো কীভাবে?
  - ইসলাম কীভাবে সন্ত্রাস প্রতিরোধ করে
  - কুরআন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কি সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ ডেকে আনে
- ইসলামে নারী
  - পুরুষের তুলনায় নারীর মর্যাদা
  - ক. নারী যেসব অবস্থায় পুরুষের সমান:

- খ. যেসব অবস্থায় নারী পুরুষের চেয়ে ভিন্ন:
- গ. পুরুষের কিছু যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য:
- রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অবস্থান
- কিছু বিচারে নারীর সাক্ষ্য পুরুষের অর্ধেক কেন?
- নারীর উত্তরাধিকার কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের অর্ধেক কেন?
- নারীর বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবক লাগে কেন, আর তালাক কেন পুরুষের হাতে?

- মুসলিম নারীর জন্য অমুসলিম পুরুষকে বিবাহ করা অবৈধ কেন?
- ইসলাম কেন একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়ে
- মহিলাদের জন্য গাড়ি ড্রাইভ করার অনুমতি নেই কেন?
- হিজাব কেন নারীর জন্য?

○ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা ও বাড়াবাড়ি

- কিছু দেশের শরী‘আ বিধান বাস্তবায়নকে উগ্রতা বলে আখ্যায়িত করা হয় কেন?

    - ইসলামী রাষ্ট্র কি মৃত্যুদণ্ড বাতিল করতে পারে?
    - ইসলামী রাষ্ট্র কি চোরের হাত কাটার শাস্তি বাতিল করতে পারে?
    - ইসলামী রাষ্ট্র কি ব্যাভিচারীর বেত্রাঘাত দণ্ড বাতিল করতে পারে?
    - বিবাহিত ব্যাভিচারিণীর প্রস্তরাঘাত দণ্ডের বাস্তবতা কী?
    - ইসলাম ত্যাগকারী কি হত্যার যোগ্য?
  - পরিশিষ্ট

- দু’টি বিষয় ভুলে গিয়ে অনেকে সময় ইসলামের প্রতিষ্ঠিত কিছু বিধান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়:
- অনেকে ইসলামী রাষ্ট্রের কিছু ধর্মীয় বিধান বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অথচ তারা ভুলে যান:

ইসলামের সমালোচনা ও তার জবাব

ড. সাঈদ ইসমাঈল চীনী

অনুবাদ: আলী হাসান তয়্যেব

সম্পাদনা: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

ভূমিকা

প্রশংসা ও স্তুতি সব মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্রতে প্রেরিত আল্লাহর সকল নবী-রাসূলের ওপর। আল্লাহ তা‘আলা সন্তুষ্ট হোন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌভাগ্যবান প্রত্যেক সাহাবী, সকল নবী-রাসূলের প্রত্যেক একনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথী এবং কিয়ামত পর্যন্ত

আগত তাদের অনুসরণকারী প্রতিটি মানুষের ওপর।

উদ্দেশ্যপূর্ণ ও উদ্দেশ্যহীন প্রচলিত নিরেট ভ্রান্তিবিলাসের অন্যতম হলো, মানুষের সসীম ও সীমিত বোধশক্তিতে নির্ভর করে অসীম জ্ঞানী আল্লাহর প্রণীত আইন ও বিচারের প্রামাণ্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা। অথচ মানুষের শ্রবণ, দর্শন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় সর্বাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্র ব্যবহারের পরও আমাদের আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক জীবনের অনেক কিছুই বুঝতে অক্ষম।

বস্তুতঃ আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি তা প্রামাণ্যকরণের দু’টি পদ্ধতি

রয়ছে: আল-মানহাজুন নাকলী বা বর্ণতি পদ্ধত এিবং আল-মানহাজুল আকলী বা অর্জতি পদ্ধত।ি বর্ণতি পদ্ধত নির্ভর কর বের্ণনাকারীর প্রামাণকিতার ওপর। চাই তনি একজন হন বা বহুজন, চাই এ বর্ণনার পরম্পরায় ব্যক্ত থিাকুন বা দল। পক্ষান্তর অের্জতি পদ্ধত নির্ভর কর প্রেধানত আমাদরে পঞ্চন্দ্রয়ি এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার ওপর।

তব বেশিষেত প্রামাণ্যতার বষিয়টি যখন সামন আেস প্রেত্যক্ষভাব স্রষ্টার সঙ্গ সেম্পৃক্ত তথ্য যমেন, পবত্রি গ্রন্থাবল নিয়ি,ে তখন সংশ্লষ্টি ধর্মীয় গ্রন্থরে প্রচারক ঐ

নবী-রাসূলের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বর্ণিত পদ্ধতির প্রমাণ থাকলে তাকে প্রাধান্য দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অর্জিত পদ্ধতির কথা আসে এরপরে। কারণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সামনে রাখলে আমরা দেখতে পাই, মানুষ প্রকৃতিতে অনাদিকাল থেকে বিরাজমান অনেক কিছুই বুঝতে পারে না। যুগ-যুগান্তরের সাধনা আর বিরামহীন প্রচেষ্টার পরই কেবল তার সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে ধারণা লাভ করেছে। এরপরও স্রষ্টার গড়া মহাবিশ্বের অনেক কিছুই দুর্বোধ্য ও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে, মানুষের সীমিত জ্ঞান সেসব চিনতে পারে না। সক্ষম

হয় না সেগুলোকে বুঝতে বা তার প্রকৃতি আবিষ্কার করতে।

অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও কিন্তু আমাদের ভেতরে সংশয় ও বিস্ময়ের জন্ম দেয়। তারপরও যে সূত্র মারফত তা আমাদের কাছে পৌঁছেছে তার ওপর আস্থার কারণে আমরা তাতে আস্থাবান হই। অর্থাৎ আমরা এ জন্য সেটাকে গ্রহণ করি না যে সাধারণ অর্জিত জ্ঞান তার অস্তিত্ব প্রমাণ করছে, বরং আমরা তা মেনে নেই বর্ণিত জ্ঞান ঐ বস্তুটির অস্তিত্ব প্রমাণ করার কারণে।

আরেকটি নগ্ন ভুল এই যে, মানুষ তার মহান স্রষ্টার ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ

বিধানের একটি সীমিত অংশ সম্পর্কে জানার পর নিজের অপর্যাপ্ত তথ্য ও অসম্পূর্ণ বোধশক্তির ওপর নির্ভর করে এই ক্ষুদ্র অংশের সমালোচনার স্পর্ধা দেখায়। এ ভুলের ঝুঁকি আরো বেড়ে যায় যখন এটি হয় কোনো পবিত্র উদ্ধৃতি, স্রষ্টার সঙ্গে যার সম্পৃক্ততা অকাট্য বা প্রায় অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আর মানুষ এই ভুল তথা একটি পবিত্র উদ্ধৃতিকে তার পূর্বাপর বা প্রেক্ষাপট বিবেচনায় না নিয়ে সমালোচনা কিন্তু অজ্ঞতা হেতু করে না। এটি করে বরং তার প্রতি অবজ্ঞা বা ভিন্নমতের প্রতি পক্ষপাত দেখাতে গিয়ে।

এমন ভুলের একটি উদাহরণ হলো, কোনো গবেষকের কোনো আসমানী আইন নিয়ে কেবল পার্থিব জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে কিংবা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ও চিরস্থায়ী আখিরাতের মধ্যে সম্পর্ক মাথায় না রেখে আলোচনা করা। কেননা, পার্থিব জীবন আখিরাত জীবনের ক্ষেতে ছাড়া কিছুই নয়। দুনিয়াতে আমরা যা চাষ করবো, সে সামান্যেরই ফসল উঠাবো আখিরাতে। আর আখিরাতে যে ফসল উঠাবো তা দিয়েই আমরা পার পাবো।

এর আরেক উদাহরণ জীবনের অন্য ক্ষেত্রের আইনের সঙ্গে এবং আখিরাতের সঙ্গে একটি আইনের

সম্পর্ক বিবেচনায় না নিয়ে গবেষকের পার্থিব জীবন সংক্রান্ত কোনো ইসলামী আইনের সমালোচনা করা। যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বা অবজ্ঞাবশত কোনো ইসলামী আইনের প্রকৃতি ও পূর্বাপর সম্পর্ক না জেনে আলোচনা করেন তিনি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যিনি একটি পূর্ণাঙ্গ বিধানের পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অংশগুলোর একটির মূল্যায়ন করেন তার সম্পূরক অংশ সম্পর্কে না জেনেই। এ ব্যক্তি আসলে ঐ ব্যক্তির মতো যে বলে রাত বা রাতের আঁধারের কী দরকার? এটি আমাদের মধ্যে ভীতি ও ত্রাস জাগিয়ে দেয়। আমাদেরকে কষ্ট করে আলোর ব্যবস্থা করতে হয়। অথচ সে এ কথা

ভুলে যায়, যদি রাত ও অন্ধকার না থাকতো তাহলে আমরা দিন ও আলো চিনতাম না। দিন ও আলোর মূল্যও বুঝতে পারতাম না।

এসব ভুলের যোগফলে এ ধরনের গবেষকগণ এমন বক্তব্য উদ্ধার করেন, যা ঐ উদ্ধৃতি বা বাণীর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই জ্ঞানী ব্যক্তি যখন পবিত্র কোনো উদ্ধৃতির সমালোচনা বা মূল্যায়ন করেন, তখন তাকে প্রথমে অবশ্যই জেনে নিতে হবে বিধানটিতে এর ভূমিকা কী। তারপরই কেবল তিনি এর প্রশংসা বা সমালোচনা করবেন।

গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে দু’টি লক্ষ্যকে সামনে রেখে:

১. আকীদা, ইবাদাত, আইন, মানবাধিকার, ইসলাম-প্রচার, উগ্রবাদ-চরমপন্থা ও নারীর মর্যাদা-অধিকার বিষয়ে ইসলামের অবস্থান এবং উগ্রবাদের অর্থ ও ইসলামী শরী‘আকে কেন্দ্র করে উত্থাপিত ইসলামের নানা উষ্ণ সমালোচনার জবাব প্রদান।

২. যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ইসলামের সামষ্টিক বিষয়সমূহের পরিচয় উপস্থাপন এবং কিছু ভাইয়ের কতিপয় জোরালো প্রস্তাবে সাড়া দান।

লেখক এতে নিম্নোক্ত পদ্ধতি ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন:

১. শুধু অমুসলিম নয়, মুসলিমদের মুখেও অধিক উচ্চারিত প্রশ্নগুলোকে বাছাই করা হয়েছে।

২. আলোচনার জন্য উত্থাপিত বিষয়ের ব্যাখ্যায় অতি সংক্ষেপে বাস্তব কিছু দৃষ্টান্তেরও সাহায্য নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি নকলী দলীলাদি বা বর্ণিত প্রমাণসমূহ তুলে ধরায় যথাসম্ভব মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

৩. সুস্পষ্ট বিরোধ ছাড়া মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোতে কেবল

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মতই উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. যেসব বিষয়ে বিরোধ সুস্পষ্ট সেসবে পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ এবং তার যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫. ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন অনির্ভরযোগ্য তথ্য থেকে বিরত থাকা হয়েছে।

বক্ষমান গ্রন্থটি আমি মূলতঃ নিজের পঠন-অধ্যয়ন ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছি। যেসব গ্রন্থ থেকে আমি উপকৃত হয়েছি, তার লেখকদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আর শুরু ও শেষের সব প্‌রশংসাই আল্‌লাহর জন্‌য। তাঁর কাছে প্‌রার্‌থনা, তিনি যেন এ গ্‌রন্‌থটি প্‌রকাশের পথে নানাভাবে যারা সাহায্‌য করছেন, তাদেরকে উত্‌তম পুরস্‌কারে ভূষিত করেন এবং এর দ্‌বারা তাঁর বান্‌দাদের উপকৃত করেন।

ড. সাঈদ ইসমাঈল চীনী

মদীনা মুনাওয়ারা ০১/০৬/১৪৩০ হিজরী

আকীদা, ইবাদাত ও আইনের সমষ্‌টির নাম ইসলাম

আকীদা, ইবাদাত, আইন ও চারিত্‌রিক আদর্‌শাবলির সমষ্‌টির নাম ইসলাম। এটিই সে আসমানী রিসালাত ঐশী

বার্তার সর্বশেষ রূপ যা সর্বপ্রথম এনেছিলেন আদম আলাইহিস সালাম। যুগে যুগে যার সংস্কার সাধন করেছেন নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ[১] সকল নবী-রাসূল। সব রিসালাত বা প্রত্যাদেশই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে তার ক্ষণস্থায়ী ও চিরস্থায়ী সৌভাগ্য বাস্তবায়নের পথে। তবে এসব রিসালতের সবই ছিল যে যুগের নবী বা যে স্থানের নবী কেবল তার উপযোগী। একমাত্র ইসলামই এসেছে সমগ্র মানবের জন্য রহমত ও শান্তি স্বরূপ এবং আসমানী সকল রিসালাতকে রহিত করতে। আল্লাহ

তা‘আলা তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧﴾ [الانبياء: ١٠٧]

“আর আমরা তো তোমাকে সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি”। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٤٠﴾ [الاحزاب: ٤٠]

“মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়, তবে আল্লাহর রাসূল ও

সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪০]

মৌলিক আকীদা ও ইবাদাতগুলো কী কী?

ইসলামের মৌলিক আকীদা এ বাস্তবতাকে ঘিরে আবর্তিত যে দুনিয়ার জীবনই পূর্ণ গল্প নয়। দেখবেন কিছু মানুষ জন্ম নিয়ে তার মধ্যে অথবা পৈতৃকসূত্রে পাওয়া সম্পত্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করার জন্য। কিছু লোক জন্ম গ্রহণ করে তার বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা অথবা দারিদ্রের সঙ্গে যুঝবার জন্য। আবার কেউ শত্রুদের শত্রুতার বলী

হয়, যেকোনো মতে এ জগতের শাস্তির হাত থেকে কোনোমতে পালিয়ে যায়। তেমনি আবার কেউ জীবন তার সৌভাগ্যের বদৌলতে সুখ ভোগ করে পক্ষান্তরে অন্যজন দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে কষ্ট ও বঞ্চনাভরা জীবনের ঘানি টেনে বেড়ায়। এখন যদি জীবনের গল্প দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয় তাহলে ইনসাফ থাকে কীভাবে? এ কারণেই ইসলাম আরেকটি শাশ্বত জীবনের কথা বলে। সেখানেই হবে চূড়ান্ত হিসাব। সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হবে পূর্ণ ইনসাফ।

প্রকৃত মৌলিক আকীদাগুলো অতীতের সব আসমানী গ্রন্থ কর্তৃকই

প্রমাণিত। আর ইসলামের দৃষ্টিতে তা দৃশ্যায়িত হয় স্রষ্টার একত্ব, তাঁর নির্দেশ পালনের অত্যাবশ্যকতা এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদাত তথা দাসত্বের মধ্য দিয়ে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾ [النساء: ٤٨]

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮, ১১৬]

ইসলামের মৌলিক আকীদাগুলো বাস্তবায়িত হয় এক আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ,

শেষ দিবস এবং ভালো-মন্দ তকদীর তথা ভাগ্যের ওপর ঈমান[২] ও বিশ্বাসের মাধ্যমে। পক্ষান্তরে মৌলিক ইবাদাত হয় ইসলামের পঞ্চভিত্তির মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ কথা স্বীকার করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানে সিয়াম পালন করা এবং যার সাধ্য আছে তার বাইতুল্লাহর হজ করা।[৩]

এসব ইবাদাত মানুষের নিত্য জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন, নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্রতা ও অযুর শর্তে পাঁচবার

সালাত আদায় করা। এটি মানুষকে সময়, শুচিতা ও শৃঙ্খলায় যত্নবান হবার প্রশিক্ষণ দেয়। একইসঙ্গে তা মানুষকে নিজের কাজে এবং তার স্রষ্টার হক সম্পর্কে আন্তরিক ও সচেতন হতে শিক্ষা দেয়। তেমনি যাকাত মানুষকে তার অভিন্ন জাতি তথা মানুষের হকের কথা, সিয়াম ক্ষতি করে না এমন সব সৃষ্টির প্রতি দয়ার্দ্র হবার প্রয়োজনীয়তার কথা এবং হজ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, যোগাযোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এটা ঠিক যে ইসলামের ইবাদাতে কোনো কোনো আমল বাহ্যিকভাবে

পৌত্তলিক ধর্মীয় আচারের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। যেমন, কাবামুখী হয়ে সালাত আদায় এবং তাকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করা ইত্যাদি; কিন্তু বাস্তবে এতদুভয়ের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী রীতি কোনো যুক্তির আলোকে নয়। এটি সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে সম্পাদ্য। তাই তা পালনের অর্থ কেবল আল্লাহ তা‘আলার পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন। পক্ষান্তরে মানুষ যেসব আচার ও রীতির কথা বলে- চাই তা যৌক্তিক হোক বা অযৌক্তিক- তা আল্লাহ তা‘আলার মূল শিক্ষার বিকৃত রূপ।

লক্ষণীয়, আকীদার মতো মৌলিক ইবাদাতগুলো ও তার মৌলিক উপাদানসমূহ ইসলাম আগমনের দিন থেকে বর্তমান পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়েছে। নিত্যপরিবর্তনশীল জীবনের প্রয়োজন ও জীবনোপকরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের সহজের জন্য অল্প কিছু ক্ষেত্রে ছাড়া (যেমন, সফরকালে সালাতে কসর এবং সিয়াম পালন না করে অন্য দিন করা) ইবাদাত খুব একটা প্রভাবিত হয় না।

তবে মানুষের সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট কিছু আইন আছে যা জীবনোপকরণ ও জীবনের নিত্য নতুন ও পরিবর্তনশীল উপকরণের দ্বারা প্রভাবিত হবে।

কিন্তু ইসলাম যেহেতু আসমানী রিসালাতসমূহ ও সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সর্বশেষ দীন তাই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা এর এমন কিছু গুণের দায়িত্ব নিয়েছেন, যা একে সর্বযুগে সর্বস্থানে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের যোগ্য করবে।

চৌদ্দশ বছর আগের শরী'আত কীভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব

হ্যাঁ, অনেকেই এ বিষয়টায় বিস্ময় বোধ করেন যে চৌদ্দশ বছর আগে আবির্ভাব হলেও ইসলাম কীভাবে তার আইনগুলোকে এই যুগের জন্য প্রাসঙ্গিক ভাবে। আশ্চর্য, এরা কীভাবে ভুলে যায় যে, মানুষ যদি এমন

নিয়ম ও আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয় যা যুগযুগান্তরের জন্য চলনসই হয়, তাহলে এই মহাবিশ্বের নিপুণ কারিগর ও খোদ এই মানুষেরও একক স্রষ্টা, যিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবই জানেন, তার পক্ষে এমন জীবন বিধান রচনা কি অসম্ভব হতে পারে?

একজন মুসলিম কর্তৃক এমন প্রশ্ন উত্থাপনের বিধান কী

জিজ্ঞাসু মুসলিম ভুলে যান তার ইসলামের আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠা কিন্তু অকাট্য বা প্রায় অকাট্যভাবে প্রমাণিত আল্লাহর সুনির্দিষ্ট আইন ও বিধানে প্রশ্নাতীতভাবে ঈমান রাখার দাবী রাখে। ভুলে গেলে চলবে না, শুধু তার

সন্দেহেই তাকে কুফুরী ও কঠিন শাস্তির মুখে ঠেলে দিতে পারে। অনাদিকাল থেকে মহা বিশ্বের নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ তা‘আলাই একমাত্র এমন বিধান রচনা করতে সক্ষম, কিয়ামত পর্যন্ত যার আবেদন ফুরাবে না। তাই মানুষের জন্য তাঁর এবং সর্বস্রষ্টা আল্লাহর বিধানের সমালোচনা করা সমীচীন নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء: ٦٥]

“অতএব, তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে

বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫]

আল্লাহ তা‘আলার বিধান নিয়ে সমালোচনা করার সময় একজন মুসলিম কীভাবে ভুলে যায় যে সে আল্লাহর নির্দেশাবলির মধ্যে কোনো কিছু নির্বাচন-বর্জনের অধিকার রাখে না। তার অধিকার নেই কোনোটাকে গ্রহণ আর কোনোটাকে বর্জন করার। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ

ﭐلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ٨٥﴾ [البقرة: ٨٥]

“তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৫]

এখানে ইসলাম গ্রহণ তথা নিজেকে আল্লাহ তা‘আলার কাছে সমর্পনের তিনটি প্রকারের অবশ্যকিতার দিকে ইঙ্গিত দেওয়া সমীচীন মনে করছি:

১. সাধারণ মূলনীতি হিসেবে আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ। এতে আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে সম্পৃক্ত সব বিধানই অন্তর্ভুক্ত। চাই সে বিধান সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক প্রমাণিত হোক, চাই ইস্তিম্বাত বা কিয়াসের মাধ্যমে প্রমাণিত। এতে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

২. অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিধানগুলোতে আত্মসমর্পণ। এতে আত্মসমর্পণ করতে হবে প্রশ্নাতীতভাবে।

৩. কিছু কিছু ফিকহী সমাধান বা ইসলামী আইনশাস্ত্রের অভিমতের

কাছে আত্মসমর্পণ। আর এতে আত্মসমর্পিত হতে হবে একজন মুসলিমের জ্ঞান (ইল্ম) অনুযায়ী অগ্রাধিকার দানের ভিত্তিতে; নিশ্চিতভাবে বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। কারণ, সুন্নাহ দ্বারা মতামতের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত।

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বলা রাখা দরকার যে, একটি রাষ্ট্রের সরকারি আদালত থেকে প্রকাশিত বিধানগুলোর মধ্যে যথাসাধ্য স্ববিরোধিতা এড়ানোর পাশাপাশি ঐ রাষ্ট্রে প্রচলিত ইজতেহাদী উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনেরও অনুমতি রয়েছে। চাই তা নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ

মাযহাব হিসেবে হোক বা উদ্ধৃতির নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে।[৪] তবে এর অর্থ এই নয় যে, সকল বিচারক সব বিচারে একই ফয়সালায় উপনীত হবেন। কেননা এখানে রায় বিভিন্ন হওয়ার মতো অনেক রয়েছে।

একজন প্রকৃত মুসলিম দৃঢভাবে বিশ্বাস করেন, এসব বিধানই ‘মুকাল্লাফ’ সৃষ্টির[৫] পার্থিব শান্তি ও সাফল্য নিশ্চিত করে যখন তাদের অধিকাংশই তা পালন করেন। আর তা ব্যক্তির দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য বয়ে আনে যখন সে এর অধিকাংশই মেনে চলে। অন্যকথায়, শরী‘আতে ইসলামীর প্রভাব শুধু

পৃথিবীর সাময়িক জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা চিরকালীন জীবন পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। একজন খাঁটি মুসলিমের পক্ষে এসব বিশ্বাসের কোনোটিকেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সুতরাং মুসলিমের কাছে যখন প্রমাণিত হয়, এসব আইন-কানুন আল্লাহর পক্ষ থেকে, তখন অবশ্যই তাকে তা মানবরচিত সকল আইন-কানুন থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করতে হয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলাই মানুষের স্রষ্টা। তিনিই ভালো জানেন কীসের তিনি তাদেরকে নশ্বর জীবনে ও শাশ্বত জীবনে সৌভাগ্যের অধিকারী বানাবেন।

ইসলাম মানুষের পার্থিব জীবনের নানা পর্যায়ের বিস্তারিত ও মৌলিক সব দিক পর্যন্ত বিস্তৃত। এতে রয়েছে আকীদা, ইবাদাত, মোয়ামালা তথা লেনদেন ও সাধারণ আদব কায়দা থেকে নিয়ে সব কিছু। এটিই একমাত্র আসমানী জীবন ব্যবস্থা, যা মানুষের সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে। এটিই একমাত্র ধর্ম যা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে এবং সৃষ্টজীবের পরস্পরের মাঝে সম্পর্কের ধরণ নির্ধারণ করে দিয়েছে।

ইসলাম মানব জীবনের এমন কোনো পর্যায় বাদ রাখেনি যার জন্য বিধানদাতা স্রষ্টার একত্ববাদের প্রতি ইঙ্গিতবাহী অন্যান্য প্রধান

বিধানসমষ্টির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আবশ্যক বিধান প্রণয়ন করেনি। আর প্রধান বিধানটি থাকবে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে যেখান থেকে যাবতীয় শাখাগত ও ব্যতিক্রম নিয়ম উদ্ভাবিত হবে।

অচিরেই বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার দ্বারা সুস্পষ্ট হবে যে কল্পনা ও বাস্তবতার মধ্যে, ব্যক্তি অধিকার ও সামষ্টিক অধিকারের মধ্যে এবং সাময়িক জীবনের চাহিদা ও চিরস্থায়ী জীবনের চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় ইসলামই সবচে সফল। তেমনি অচিরে আমাদের সামনে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হবে, ইসলামী আইন চৌদ্দ শতাব্দী আগে যেসব অধিকারের কথা

বলছে মানব রচিত আইনগুলো সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতেই কেবল তার কথা বলছে। উপরন্তু এর অনেকগুলোই আবার বাস্তব ক্ষেত্রে এখনো প্রয়োগ হয় না।

ইসলামী শরী‘আ ও বাস্তবতার সম্পর্ক

এটা ঠিক মানুষকে আল্লাহ তা‘আলা যে সুস্থ প্রকৃতি ও অর্জিত জ্ঞান দান করেছেন তা তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের গুটিকয়ের রহস্য অনুধাবন করতে সমর্থ করে। তাই বলে তারা আল্লাহর সব বিধানের রহস্য উদ্ধার বা পরিপূর্ণ জ্ঞানের দাবী করতে পারে না। অন্য কথায় বলতে গেলে, আল্লাহ

প্রদত্ত বিধানের গুটিকয়ের রহস্য অনুধাবন না করতে পারা পরিবর্তিত বাস্তবতায় তার অগ্রহণযোগ্যতা বা অকার্যকারিতার প্রমাণ নয়।

যিনি গভীর দৃষ্টিতে ইসলামের বিধান এমনকি ইবাদাতের দিকে তাকাবেন, তিনি লক্ষ্য করবেন ইসলামের বক্তব্য এবং বাস্তবতার মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব খুব স্পষ্ট। যেমন, পানির দুষ্প্রাপ্যতায় অযু-গোসলের জন্য তায়াম্মুমই যথেষ্ট। তেমনি মুকীম ব্যক্তিকে যোহর, আসর ও এশা চার রাকাত আদায় করতে হয়, অথচ মুসাফিরের জন্য এ ওয়াক্তগুলোতে শুধু দু’রাকাত আদায়ই যথেষ্ট।

যিনি ধারাবাহিকভাবে অহী নাযিলের দিকে এবং শরী‘আতের অনেকগুলো বিধানের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন, তিনিও ইসলামের বক্তব্য ও বাস্তবতার মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব সুস্পষ্ট দেখতে পাবেন। ইসলামের বিধানগুলো আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে ২৩ বছর সময়কালে এবং মদকে হারাম করা হয়েছে কয়েকটি পর্যায়ে। একইভাবে এ প্রবণতা প্রতিভাত হয় অনেক বিষয়ে সঙ্গত কারণে মুসলিম আইন বিশারদদের মাঝে সঙ্গত বিরোধের মধ্য দিয়ে।

ইসলামের বক্তব্য ও বাস্তবতার মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবকে যুক্ত করা হয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের ‘নাসেখ’ ও ‘মানসুখ’-এর সঙ্গে, যেখানে একই বাস্তবতায় নতুন বিধান পুরাতন বিধানকে রহিত করে দেয়।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সুস্পষ্ট বক্তব্যধারী নির্দিষ্ট কোনো বিধান বাতিল করা আর বাস্তবায়নের শর্ত পূরণ না হওয়ায় কোনো বিধান বাস্তবায়ন স্থগিত করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রসিদ্ধ যেসব অবস্থায় বিধান রহিত না হওয়া সত্ত্বেও তার প্রয়োগ স্থগিত করা হয়েছিল তার অন্যতম হলো আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-

এর যুগে যাকাতের অংশের মধ্য থেকে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ‘মুআল্লাফাতু কুলুব’ বা যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের অংশ প্রদান স্থগিত করা। কারণ কিছু কিছু কাফের ইসলামকে প্রত্যাখ্যান অব্যাহত রাখা সত্ত্বেও ‘যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয়’ অংশের সুযোগ গ্রহণ করে আসছিল। অথচ ততদিনে সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত এবং ইসলাম তার অনুসারীদের নিয়ে শক্তিশালী হয়েছিল।[৬] উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ঠিক একইভাবে দুর্ভিক্ষ ও মন্বান্তরের বছর চোরের হাত কাটার বিধান স্থগিত করেছিলেন।[৭]

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এক্ষেত্রে বিধান বাতিল করেন নি, যেমন বুঝতে ভালোবাসেন অনেকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়। তিনি যখন একটি অরহিত বিধানের বাস্তবায়নের শর্ত অনুপস্থিত দেখেন তখন তার প্রয়োগ স্থগিত করেন মাত্র। এ থেকে জানা গেল কোনো বিধান বাতিল হওয়া আর কিছু শর্ত না পাওয়ায় তার প্রয়োগ স্থগিত করার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

এখানে আরেকটি সন্দেহের অপনোদন জরুরি। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু যে বনী তাগলাব গোত্রের খ্রিস্টানদের ‘জিযিয়া’ নামক কর অবকাশে সম্মতি দিয়েছিলেন তার মাধ্যমে কিন্তু তিনি

আরোপিত কর (ফরয জিযিয়া) বাতিল করেন নি, বরং তা করেছিলেন এর নাম বদলে পরিমাণ সংশোধনের অভিপ্রায়ে। কারণ, তিনি তাদের থেকে যাকাতের দ্বিগুণ উসুল করেছিলেন।[৮] সুতরাং বিধান বাতিল করা আর জনস্বার্থে বিধানে ঈষৎ পরিবর্তন আনা এক নয়।

বর্তমানে ইসলামী দেশগুলো মুসলিম নাগরিকের ওপর যে কর আরোপ করে তা অনেক সময় তার এক বছর অতিবাহিত হওয়া সঞ্চিত পুরো অর্থের সমান হয়। এ ক্ষেত্রে তাকে যাকাত দিতে হবে না। আবার কখনো তা তার কিছু সম্পদের ওপর আরোপ হয়। এ ক্ষেত্রে তার যাকাতের পরিমাণ

কমিয়ে দেওয়া হবে। যেমন অমুসলিম নাগরিকদের ওপর আরোপিত জিযিয়া নামক কর কখনো তার বার্ষিক কর বা অন্য কোনো করের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর এটি কদাচিতই জিযিয়ার অনুরূপ হয়।

ইসলামী শরী‘আর স্থায়িত্বের প্রধান কারণ কী কী?

এটা ঠিক যে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিধানসমূহ অনেক সময় জীবন যাপন পদ্ধতি ও এর নিত্য পরিবর্তনশীল উপকরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়; কিন্তু ইসলাম যেহেতু আসমানী সব রিসালাতের পরিসমাপ্তিকারী এবং এটি সমগ্র বিশ্ব

মানবতার জন্য প্রেরিত তাই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা‘আলা এর মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের দায়িত্ব নিয়েছেন যা একে সর্বযুগে সর্বস্থানে প্রয়োগ উপযোগী রাখবে। এসব বৈশিষ্ট্যের কিছু নিম্নরূপ:[৯]

প্রথমত: অকাট্যভাবে প্রমাণিত আইন সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোকে সাধারণ নীতিমালার ওপর কেন্দ্রীভূত রাখা। বিশেষত শরী‘আতের প্রধান উৎস তথা আল-কুরআনে এবং কিছু কিছু হাদীসে। যেমন, আল্লাহর নির্দেশিত বিষয় পালন ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকার গুরুত্ব, ন্যায়ানুগতা, যুলুম হারাম হওয়া, ব্যবসা হালাল হওয়া আর সুদ

হারাম হওয়া এবং বিবাহকে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতার পূর্ণতম উপায় বানানো ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত: এসব আইন সংক্রান্ত পয়েন্ট ও মৌলিক নীতিমালা মুকাল্লাফ মাখলুকের প্রকৃতিজাত মৌলিক উপাদান নির্ভর হওয়া। যেমন, রূহগত, জ্ঞানগত, অন্তরগত ও অঙ্গসংশ্লিষ্ট উপাদান, তার মূল প্রকৃতি ও প্রমাণিত মৌলিক প্রয়োজনাদি।

তৃতীয়ত: ইসলাম কিছু বিষয় বিস্তারিত বলে দিয়েছে, বিশেষত সুন্নতে নববীতে। তদুপরি এসবকে এমন প্রমাণিত বিষয় হিসেবে গণ্য করেছে যা পরিবর্তন

হবার নয়। যেমন, মুকাল্লাফ দুই সৃষ্টি তথা জীন ও ইনসান অর্থাৎ মানব ও দানবের দুনিয়া-আখিরাতের সৌভাগ্য বয়ে আনার মৌলিক প্রয়োজনাদি। অথবা এমন যা পরিবর্তন হওয়া উচিৎ নয়। যেমন, অকাট্যভাবে প্রমাণিত ওয়াজিব ও হারামসমূহ। যেগুলোকে পরিবর্তনের আওতায় আনা যায় সেদিকে লক্ষ্য করে আমরা এর নামকরণ করতে পারি ‘ছাওয়াবেত’ বা অপরিবর্তনীয় হিসেবে।

পরিবর্তন যদিও কেবল জীবন প্রণালী ও এর উপকরণকেই স্পর্শ করে কিন্তু তা প্রকৃতির বাইরে না যাওয়া উচিৎ, যা দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের

সৌভাগ্যের চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। আর আল্লাহ প্রদত্ত আইনই নির্ধারণ করবে কোনোটি বৈধ, প্রকৃতি বিরুদ্ধ নয় এবং কোনোটি মানুষের জন্য ক্ষতিকারক এবং তার প্রকৃতি-বিরোধী। কারণ, এ মহাবিশ্বের স্রষ্টাই বিশ্ব চরাচরের সবার প্রকৃতি বান্ধব উপায়-উপকরণ এবং প্রকৃতির সুরক্ষা ও তার সমস্যা দূরিকরণের উপায় সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন।

পক্ষান্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞানগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়েই বলা যায় যে মানব মনন ও তার অভিরুচিতে সে যোগ্যতাই রাখা হয় নি

যদ্বারা সে অজ্ঞাত রহস্য বা কারণ বিচার করতে পারে। সুতরাং মানুষের জ্ঞান, জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা এবং আশপাশের অনুধাবনযোগ্য বিষয় সম্পর্কে তার ধারণা সীমিত। আর অননুধাবনযোগ্য বিষয়ের জ্ঞান তথা যেসব বিষয় পঞ্চেন্দ্রীয়ের মাধ্যমে জানা যায় না, সে ব্যাপারে মানুষ আরও দুর্বল। এ জন্যই সে এর অনেকে কিছুই জানে না এমনকি বিস্ময়কর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যুগেও, অথচ সে তা ব্যবহারে বাধ্য।

চতুর্থত: মহান স্রষ্টা আইনের প্রধান উৎস হিসেবে নিচের উৎসগুলোকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন:

১. আল-কুরআন। এটি তার বক্তব্য ও কাঠামোসহ আল্লাহ তা'আলার বাণী। একে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে বর্ণনাক্রমে অর্থাৎ একজন হাফেয থেকে আরেকজন হাফেয থেকে। এভাবে একাধিক সূত্রে ধারাবাহিক বর্ণনাক্রমে তা গিয়ে পৌঁছেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত। তাছাড়া তা লিখিতভাবেও সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

২. সুন্নাতে নববী। তা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি, কর্ম ও সমর্থন। অর্থাৎ কুরআনে যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং সারা জীবনে তাঁর ওপর

পরোক্ষভাবে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার বাস্তবায়ন হিসেবে তিনি যা করেছেন এবং যাতে সমর্থন ব্যক্ত করেছেন, তার সমষ্টি। আর সুন্নাতে নববীকে সংরক্ষণ করা হয়েছে মুখস্থকরণ ও সুনির্দিষ্ট নিয়মের আলোকে সংকলনের মাধ্যমে। সংকলক তাঁর নিজস্ব নিয়মের আলোকে তা এমনভাবে সংকলন করেছেন যে তা নির্ভুল ও বিচ্ছিন্ন হাদীছের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশে যথেষ্ট। উল্লেখ্য, অধিকাংশ সুন্নাহই দৃঢ় নিয়মের আলোকে সংকলিত হয়েছে।

৩. ইজতিহাদ। এটি মূলত বাস্তব জীবনে মানুষের নানা সমস্যার সমাধানে

কুরআনুল কারীম ও সুন্নতে নববীর যেসব বক্তব্য ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে তার ব্যাখ্যা এবং এতদুভয় থেকে উদ্ভাবনকে অন্তর্ভুক্ত করে। অনুরূপ কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধান কেন্দ্রীক কিয়াসও এর অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু তা যেসব বিষয়ে কুরআন বা সুন্নাহর কোনো নিকট বা দূরতম ইঙ্গিতও নেই সেসব বিষয়ে জ্ঞান ও বুদ্ধি ব্যবহার করে জীবনের নিত্য পরিবর্তনশীল সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় বিধানের প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান করে। তবে তা এসব বিধান কুরআনুল কারীম বা সুন্নাতে নববীর কোনো নির্ভরযোগ্য

বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়ার শর্তে।

অন্য কথায়, এই ইজতিহাদে নিচের উৎসগুলোও অন্তর্ভুক্ত[১০] যাকে আমরা কিয়াস[১১], ইসতিহসান[১২], উরফ[১৩], মাসালেহে মুরসালা[১৪], সাদ্দে যারায়ে‘[১৫] ও ইসতিসহাব[১৬] বলে থাকি। এসব উৎসের মূলে আক্বল বা জ্ঞানই প্রধান ভূমিকা রাখে। তেমনি ইসলামী আইনকে স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে মানানসই করতে ‘উরফ’ ভূমিকা রাখে।

এসব উৎস গ্রহণযোগ্য মতামতসমূহ এবং জীবন প্রণালী ও এর উপকরণসমূহের নিত্যপরিবর্তনের

বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে বক্তব্য কার্যকরণে বিভিন্নতা ও স্থিতিস্থাপকতার ব্যাপক অবকাশ রাখে।

এটি কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিপরীত যা সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিপূর্ণ মানব জ্ঞান, মানব প্রকৃতির মূল্যবোধের বিকৃতি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের রুচি ও পছন্দমত বিধান রূপদান নির্ভর। যে রুচি ও পছন্দ কখনো আংশিক কখনো পুরোটাই আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে যে প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। অতএব ইসলামে গ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য ইজতিহাদের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড মানুষের

স্বভাব বা অভিরুচি নয়; বরং আসমানী অহী এবং তার আলোকে রচিত ইজতিহাদ।

এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে শরী‘আতে ইজতিহাদের জন্য মুজতাহিদকে কিছু মাধ্যমের ওপর পারদর্শী হতে হয়। কিছু মাধ্যম কেন জানা দরকার তা আমরা বুঝতে পারি নিচের দৃষ্টান্ত থেকে:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الأُخْرَى شِفَاءً».

“তোমাদের কারও পানীয়তে যদি মাছি বসে তবে সে যেন তা ডুবিয়ে নেয়। কারণ তার এক পাখায় রোগ আছে এবং আরেক পাখায় প্রতিষেধক আছে।”[১৭] এই হাদীসে ‘আমর’ তথা নির্দেশবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে ইসলামী আইনের মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় কেউ মনে করেন, এমন করা বোধ হয় জরুরি। কেউ আবার আরও দূরে চলে গেছেন। তার মতে, হাদীসটি আসলে বাজারে উপস্থাপিত খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা ছেড়ে দেবার বৈধতার প্রমাণ। এ ব্যক্তি হয়তো এ কথা বলছেন হাদীসটিকে অপমান করার জন্য, ফলে হাদীস নয় কেবল তিনিই হয়েছেন

অপমানিত। নয়তো তিনি হয়তো সদুদ্দেশ্যেই বলছেন। এ ক্ষেত্রে তাকে ইসলামী বিধান বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিখতে হবে। বস্তুত এ হাদীস একটি তাত্ত্বিক রহস্য উন্মোচন করেছে। যদি ঐ পানীয় মানুষ পান করতে চায় তাহলে তা থেকে উপকৃত হবার পন্থা বাতলে দিয়েছে। হাদীসের উদ্দেশ্য বাছবিচারহীন সব খাদ্যেই এমন করা নয়, যা মানুষের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়।

অনেক মুসলিমও আছেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস এবং উটের মূত্র পান করলে কিছু রোগ ভালো

হবার হাদীসটিকে অদ্ভুত মনে করেন। অথচ হাদীস দু'টি বিশুদ্ধ। এই এরাই আবার উপকারী মানব আবিষ্কারগুলোয় আস্থাবান হন। যেমন, তারা অজগরের বিষকে প্রতিষেধক ও প্রতিরোধমূলক স্বভাবসম্পন্ন টিকা হিসেবে গণ্য করেন।

এ ধরনের মুসলিমদের দেখা যায়, তারা পশ্চিমা আইন-কানুন সম্পর্কে খুব ভালো জানেন; কিন্তু ইসলামী আইন বিষয়ে তাদের জ্ঞান একেবারে সীমিত। ফলে তারা অপর আইন সম্পর্কে অজ্ঞ, যার জ্ঞান ছাড়া এটিকে বিচার করা সম্ভব নয়। যেমন, «النَّظَافَةُ مِنَ

الإيمان» ‘পবিত্রতা ঈমানের অংশ’ এবং ‘«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (ইসলামে) ঠকানো বা ঠকা- কোনোটারই অবকাশ নেই’ ইত্যাদি হাদীস। এমন অনভিপ্রেত জটিলতা প্রায়ই তখন সৃষ্টি হয় যখন কোনো মুসলিম ইসলামী বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন সেক্যুলার আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে। ফলে তার কাছে বিষয়টি ঘোলাটে বলে প্রতিপন্ন হয়। অথচ সে যদি বিষয়টি যথাযথভাবে ভেবে দেখে তাহলে খুব কমই ঐ বিষয়টিকে অস্বীকার করতে পারবে।

৪. ইজমা। এটি ইজতেহাদের মতোই। তবে এটি এমন ইজতেহাদ কোনো যুগে যেমন সাহাবী বা তাবেঈদের যুগে যে

বিষয়ে আলেমগণ একমত হওয়ার ফলে তা আরও জোরালো ও শক্তিশালী হয়েছে। শক্তির দিক থেকে কুরআনুল কারীম এবং সুন্নতে নববীর পরই এর স্থান। উসূলবিদগণ সাধারণত একে কুরআন-সুন্নাহর পরই স্থান দেন। সুতরাং ধারাবাহিক বিন্যাস নয়; শক্তির স্তরই প্রচলিত ধারাবাহিকতার ভিত্তি।

এ কারণেই ইসলামী আইনে জীবনের নিত্য নতুন সমস্যা মোকাবেলায় যথেষ্ট নম্রতা ও উদারতার অবকাশ থাকায় বিস্ময়ের কিছু নেই। ইসলামী আইন-কানূন যদিও কয়েক শতাব্দী প্রাচীন বিধি-বিধান নির্ভর; কিন্তু তাতে এমন কিছু সুযোগ বা অবকাশ

রাখা হয়েছে যা সাম্প্রতিকতম বাস্তবতাতেও প্রয়োগযোগ্য। এই অবকাশ ও প্রশস্ততা বুঝা যায় নিচের ধারাগুলো থেকে:

১. কিছু বক্তব্য সমর্থন ও প্রত্যাখ্যান কিংবা দুই বক্তব্যের মধ্যে অগ্রাধিকার দানের বেলায় মতের স্বীকৃত বিভিন্নতা। আর বক্তব্য যাচাইয়ের জন্য ত্রুটিপূর্ণ মানবিক জ্ঞানে সীমাবদ্ধ থাকা যথেষ্ট নয়। নতুবা অনেক কিছুকেই অস্বীকার করতে হবে। এমনকি গবেষণামূলক আবিষ্কারগুলোকেও। যেমন, মারণব্যাধি মোকাবেলায় প্রাণবিনাশী অজগরের বিষ ব্যবহার ইত্যাদি।

অতএব নির্ভরযোগ্য বর্ণনা বা প্রচলিত কথাতেও আস্থা রাখার বিকল্প নেই।

২. বক্তব্য ব্যাখ্যা এবং তা থেকে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিভিন্নতা। কারণ, পদ্ধতি কখনো বিভিন্ন হয়, যদিও তা অল্পই হয়। তেমনি তথ্য ও মতামতে ব্যক্তিগত প্রেক্ষাপট ও প্রবেশপথ বিভিন্ন হয়। বিভিন্ন হয় বক্তব্যের পূর্বাপর সম্পর্কে অবগতি এবং যে ভাষায় বক্তব্য প্রদত্ত হয়েছে তা অনুধাবনের যোগ্যতা।

৩. প্রকৃত অবস্থা নির্ণয়ে স্বীকৃত বিভিন্নতা। বহু মানুষ পর্যাপ্ত সূক্ষ্ম

মাধ্যম ব্যবহার করে এমনকি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে পর্যন্ত প্রকৃত অবস্থা নির্ণয়ে মত ভিন্নতার জন্ম দেয়।

৪. **বক্তব্য ও বাস্তবে প্রয়োগে স্বীকৃত বিভিন্নতা। এর উদাহরণ:** ‘কিস্তিতে বিক্রির ক্ষেত্রে কি সুদের হুকুম প্রযোজ্য’? কারণ বস্তুত বিক্রেতা এখানে একটি ব্যাংকের মতো সম্পদ লেনদেন করে। অথচ তা বাইয়ে ‘ঈ‘না’য় সুদ হবে না। তেমনি ‘সব ধরনের প্রতিযোগিতাই কি নিষিদ্ধ জুয়ার অন্তর্ভুক্ত’? ইত্যাদি।

৫. মাধ্যমিক উৎস নির্বাচনে স্বীকৃত বিভিন্নতা। যেমন, ইসতিহসান,

মদীনাবাসীদের আমল, সাহাবীদের উক্তি ও পূর্ববর্তীদের শরী‘আত।

[ইসলামে মানবাধিকার]

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন,

﴿وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا ٧٠﴾ [الاسراء: ٧٠]

“আর আমরা তো আদম সন্তানদেরে সম্মানিত করেছি এবং আমরা তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিযিক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে

অনেকের উপর আমি তাদেরকে অনেক মর্যাদা দিয়েছি।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৭০]

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা বানিয়েছেন।[১৮] তাদেরকে পৃথিবীর উত্তম বস্তু থেকে উপকৃত হবার এবং তা ব্যবহার করে পার্থিব ও চিরস্থায়ী জীবনের কল্যাণ অর্জনের স্বাধীনতা দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি তাদেরকে এ পৃথিবী আবাদ করা এবং এতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও দিয়েছেন।

তিনি সকল মানবকে একই উপাদান তথা মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।[১৯] অতপর এক পিতা ও এক মাতা থেকে তাদের

সংখ্যা ক্রমে বাড়াতে লাগলেন।[২০] তাইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى».

“হে লোকসকল, তোমাদের রব এক। তোমাদের পিতা এক। মনে রেখো, অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আরবের ওপর অনারবেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর ওপর লালের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আবার লালের ওপর কালোরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে।”[২১]

হাদীসে উল্লিখিত এই সাম্যের আহ্বান কিন্তু বহুল উচ্চারিত সাধারণ মানবাধিকারের শ্লোগানের মতো নয়। এর তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য হলো তা কথার নয়, কাজের।

মানুষকে সম্মানিত করার অংশ হিসেবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে সর্বোত্তম অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন[২২] এবং তার পিতামাতার ওপর তার একটি সুন্দর নাম রাখা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। সুন্নত করেছেন সন্তানের শুভাগমনের আনন্দ উদযাপন করা এবং এজন্য তাঁর উদ্দেশ্যে কুরবানী করা।

অতঃপর তাদের ওপর তাকে সুন্দরভাবে লালন-পালন অপরিহার্য করেছেন যাতে সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। পাশাপাশি তিনি তার জন্য নানা সামাজিক অধিকারও সংরক্ষণ করেছেন।[২৩]

ইসলামে ইনসাফ ও সমতার অর্থ

ইসলামে ইনসাফ ও সমতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইনসাফ ব্যাপক আর সমতা বা সাম্য আপেক্ষিক। আবার সাম্য তখনই ইনসাফ হবে যখন তা হবে আপেক্ষিক।

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের দিয়েছেন জন্মগত দান

(যেমেন জ্ঞান) ও অর্জনীয় দান (যেমেন উত্তরাধিকারযোগ্য সম্পদ) অর্জনেরে বিশেষে সুযোগ। যাতে একটি আরকেটেরি সম্পূরক হয়। এটি কিন্তু ইনসাফ পরিপন্থী নয়। সাধারণ সমতা ইনসাফ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জিনিসি, বরং সমতার কিছু প্রকার আছে সম্পূর্ণ ইনসাফ পরিপন্থী। যেমেন অলস ও কর্মঠেরে মধ্যে সমতা, মেধাবী ও মেধাহীনেরে মধ্যে সমতা, ছাত্র ও শিক্ষকেরে মধ্যে সমতা, পিতা ও পুত্রেরে মধ্যে সমতা, পরিবারেরে সদস্য ও পরিবার বহির্ভূত লোকেরে মধ্যে সমতা এবং স্বদেশী ও বিদেশিরি মধ্যে সমতা। এ জন্যই পরীক্ষা আর এ জন্যই পার্থক্য নির্ণায়ক সুস্থ

প্রতিযোগিতা সবার দৃষ্টিতে বেঁধে। এ জন্যই কারো প্রতি কাউকে আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়। যাতে বজায় থাকে সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীর শৃঙ্খলা। মুসলিম ও অমুসলিম সমাজে এ ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই।

উত্তম-অনুত্তম নির্ণয়ের বেলায় যদিও অর্জনীয় গুণাবলির ক্ষেত্রে উন্নতির দরজা খোলা আর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলির ক্ষেত্রে দ্বার বন্ধ তথাপি উভয় গুণের পরিমাণ অনুপাতে তার দায়িত্বও বেশি হয়ে থাকে। যেমন, ধরুন, যার মেধা ও জ্ঞান বেশি নিজ ও সমাজের প্রতি তার

দায়িত্বও বেশি। অনুরূপ যার বিত্ত ও সম্পদ অধিক তার দায়িত্বও বড়।

সুতরাং কেবল তুলনামূলক সমতাই পারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য বা তার প্রকৃতির যোগ্য বিষয় দেওয়ার নামই ইনসাফ। প্রাকৃতিকভাবে ভিন্ন মানুষগুলোর মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার নাম ইনসাফ নয়। (যেমন, নারী-পুরুষ, পিতা-পুত্রের মধ্যে কালগত অগ্রাধিকার বা অর্জিত গুণ যথা অলস ও পরিশ্রমী)

অতএব, বিচারে ইনসাফপূর্ণ সমতার ভিত্তি চূড়ান্ত অর্জন নয়; বরং প্রাপ্ত যোগ্যতার সঙ্গে তুলনামূলক লব্ধ

চেষ্টা। অন্যভাবে বললে, প্রদত্ত যোগ্যতার চেয়ে ব্যয়িত প্রচেষ্টা নির্ভর বিচারের নামই ইনসাফ।[২৪]

অনুরূপভাবে ইসলামে ইনসাফেরও দাবী সৃষ্টজীবের অধিকারগুলোর কোনো পূর্ণ প্রতিদান, চূড়ান্ত পরিণাম বা ইনসাফপূর্ণ দায়মুক্তির ব্যবস্থা থাকা। তাইতো ইসলামের ইনসাফ ইহকালীন জীবনকে পূর্ণ গল্প মনে করে না। বরং পরকালীন জীবনকে বিকল্পহীন পরিপূরক অংশ গণ্য করে। দেখবেন ইহকালে ভাগ্যবান ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য কোনো কষ্ট-চেষ্টা ছাড়া পার্থিব সব সুখে ডুবে থাকে। অথচ কোনো প্রাণপণ চেষ্টাকারী ব্যক্তি

তার চেষ্টার উপযুক্ত প্রতিদান লাভের আগেই মরে যায়। দুনিয়ায় কখনো নিপীড়ক তার নিপীড়নের মাধ্যমে সুখী হয়। বেঁচে যায় তার উচিৎ সাজা থেকে। অথচ নিপীড়িত ব্যক্তি তার পাওনা বুঝে পাবার আগেই বিষণ্ণ বদনে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

এ থেকেই চূড়ান্ত জীবনে ব্যাপক ইনসাফপূর্ণ হিসাবের প্রয়োজন অনুভূত হয়। যেখানে ত্রুটিকারী তার উচিৎ শাস্তি ভোগ করবে। (অবশ্য আল্লাহ যদি ক্ষমা করেন, তবে তা ভিন্ন কথা।) আর পরিশ্রমকারী তার প্রতিদান লাভ করবে হিসাব ছাড়া। অতএব, আখিরাতেই হবে সৃষ্টজীবের

প্রাপ্যের ব্যাপক, পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত বণ্টন।

ইসলামে স্বাধীনতার অর্থ

ইসলামে স্বাধীনতা বলতে নাস্তিক্যবাদী শ্লোগানগুলোর মতো অনিয়ন্ত্রিত বা নামমাত্র নিয়ন্ত্রিত স্বাধিকার বুঝায় না। ইসলাম একটি বাস্তববাদী ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির ধর্ম। এতে তাই স্বাধীনতা একটি আপেক্ষিক বিষয়। কেননা মানুষ আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় নিয়মের এক বিশাল জালের ভেতর আবদ্ধ, যা এ মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। আল্লাহ তা‘আলাই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। এতে যা কিছু

হচ্ছে তা সরাসরি তাঁর নির্দেশে কিংবা তাঁর সৃষ্ট স্বয়ংক্রিয় নিয়মের মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে। এ মহাবিশ্বে কোনো কিছুই তাঁর নির্দেশে বা ইঙ্গিত ছাড়া হয় না। আর তিনি তাঁর সৃষ্টির ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

তবে এর অর্থ এই নয় যে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়াতে মানুষের জীবন প্রণালী কেমন হবে সে রায় দিয়ে দিয়েছেন। অনেকে যেমন তাকদীরের ইসলামী আকীদাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন। বস্তুত তাকদীর হলো, বান্দার যাবতীয় কাজ-কর্মের পূর্ব লিখন। যা কেবল স্রষ্টার নিরংকুশ জ্ঞান নির্ভর। এটি এমন এক জ্ঞান

যা কোনো স্থান, কাল বা সসীম ইন্দ্রীয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এমন জ্ঞান, যা সর্বস্থান ও সর্বকালের সব বস্তুকে পূর্ণভাবে বেষ্টন করে রেখেছে।[২৫]

মানুষের স্বাধীনতা দায়বদ্ধ তার স্রষ্টার প্রতি, যিনি তাদেরকে বানিয়েছেন পৃথিবীতে তাঁর বান্দারূপে, যিনি সকল সৃষ্টিকে করেছেন তাদের অনুগত। অগণিত সৃষ্টিকে তিনি মানুষের বশীভূত বানিয়েছেন যাতে তারা সাময়িক জীবনে এসবকে নি'আমত হিসেবে গ্রহণ করে। এসবকে বশে এনে যাতে অর্জন করতে পারে পরকালীন জীবনের শাশ্বত সুখ। মৌলিকভাবে এ দায়িত্ব বর্তায়

তার আকল-বুদ্ধি, হেদায়াত-সুপথ (আসমানী শিক্ষা) এবং অনিবার্য পরিণামধারী উপকরণ নির্বাচনের স্বাধীনতার ওপর। একইভাবে সে নিজের প্রতি এবং অন্যান্য সৃষ্টির প্রতিও দায়বদ্ধ।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, সাধারণ অবস্থায় মানুষের পক্ষে মহাজাগতিক নিয়মের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সে আসমানী শিক্ষাকে উপেক্ষা করতে পারে। যদিও তা হবে বিশেষভাবে চিরস্থায়ী জীবনে তার প্রত্যাবর্তনস্থলের হিসাবে। সুতরাং স্বাধীনতা মুফতে আসবে না, আর মুফতে তা সংরক্ষণ করা সম্ভবও নয়।

এক ধাপ এগিয়ে বলা যায়, মানুষের স্বাধীনতা যে জনসমষ্টির মধ্যে সে বাস করে তার বিশ্বাস ও চেতনার সঙ্গে জড়িত। চাই সে জনসমষ্টি পরিবার হোক কিংবা সেই কর্মস্থল সংগঠন হোক। আর যা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাধারণ ব্যাপারগুলোতে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতের অনুসারী। একটি দেশে একটি জনসমষ্টির ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য বিশ্ব-সমাজ বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাই প্রযোজ্য।

চুক্তির নিয়ম হলো, মানুষ যখন সদস্য হিসেবে সুবিধাদি ভোগ করার জন্য স্বেচ্ছায় কোনো কিছু নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেয় কিংবা কোনো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন তাকে চুক্তির সময়সীমা অতিক্রম কিংবা দ্বিতীয় পক্ষের চুক্তি প্রত্যাহার পর্যন্ত এর ধারাগুলো মেনে চলতে হয়। অন্যথায় তাকে ভোগ করতে হয় শাস্তি।

এসব চুক্তি সত্ত্বেও মানুষের অনেক বিষয়ে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা রয়েছে। নশ্বর ইহকালের বিচারে কিংবা শাশ্বত পরকালের মানদণ্ডে ভালো-মন্দ গ্রহণের স্বাধীনতা ছাড়াও মানুষ

বহুবিধ স্বাধীনতার অধিকারী। এসবই গ্রহণীয় বা অগ্রহণীয় বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের পরিচায়ক।

সুতরাং বৈষম্য ও বিভিন্নতা মানব সমাজের কল্যাণ সাধনে অন্যতম অপরিহার্য প্রাকৃতিক গুণ। অন্যথায় মানুষের জরুরি প্রয়োজনাদি ও সুখ-সমৃদ্ধি অর্জনে সহজাত সম্পদগুলোকে কাজে লাগাতে প্রেরণাদায়ী প্রতিযোগিতা দুর্বল হয়ে পড়বে। তাছাড়া মানুষের পরিচয় ও পারস্পরিক সহযোগিতার জন্যও এই বিভিন্নতা অপরিহার্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣﴾ [الحجرات: ١٣]

“হে মানুষ, আমরা তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিতি হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত”। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩]

নাগরিকের বাক স্বাধীনতা

অনেক মুসলিমই মনে করেন তার পরিপার্শ্বের সবিশেষ পশ্চিমা সমাজের সফল সংগঠনগুলোই কেবল মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বাস্তবায়ন করতে পারে। কেননা এসব সংগঠন ব্যক্তির চিন্তা ও মতামতের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আমরা যদি এসব মুসলিমকে জিজ্ঞেস করি, সত্যি করে বলুন তো, আপনারা কি এসব সমাজে বিদ্যমান বল্গাহীন সেই স্বাধীনতা পছন্দ করেন যা পরকালের অনন্ত জীবন বরবাদ করার মতো কাজেরও সুযোগ দেয়? স্বভাবতই তাদের উত্তর হবে, না।

আর যদি বাক স্বাধীনতার উদ্দেশ্য হয় (কথা ও কৌশলের মাধ্যমে) সৎ কাজের

আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের অধিকার, তবে মুসলিমদের তো কোনো বিদেশি সমাধান আমদানী করার প্রয়োজন নেই। এ অঙ্গনে তারাই বরং অগ্রগামী। বিশেষত ক্ষমতাসীনদের ইষ্ট কামনায়।[২৬] হ্যা, এখন মুসলিমদের দরকার কেবল এ ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসা। এ অর্থে বাক স্বাধীনতা কোনো মুসলিমের শুধু অধিকার নয় যাকে সে উপেক্ষা করতে পারে; বরং তা তার ধর্মীয় কর্তব্য। তার বিশ্বাস ও ঈমানই তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

তবে এ দায়িত্বটুকু পালন করতে হবে ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত মূলনীতির

আলোকে। এ মূলনীতির সবচে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, তা কুরআন, সুন্নাহ ও মুসলিম উম্মাহর আলিমদের সর্বসম্মত মত বা তাদের ‘ইসতিমবাত’ তথা ইসলাম বিষয়ক মাসআলা উদ্ভাবন নীতির পরিপন্থী না হতে হবে। পরন্তু তা এমন পদ্ধতিতে সম্পাদিত হতে হবে, যা কোনো মানব সমাজের কল্যাণ সাধন বা তা রক্ষার স্বয়ংক্রিয় প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করে। এ পদ্ধতির সবচে গুরুত্বপূর্ণটি হলো, তা হতে হবে উত্তম ও সুন্দর উপদেশমূলক এবং সমাজের সামর্থ্যবানরা এ দায়িত্ব পালনে কোনো গাফিলতি করতে পারবে না; যদিও তাদের হতে হয় কষ্টের

সম্মুখীন। এদিকে সমাজের দায়িত্ব তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান এবং এর উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাকে উৎসাহিত করা। এ পরিবেশের দাবি, একটি সীমিত গোষ্ঠীকে নিষ্পাপ মনে করে কিংবা কেবল তাদেরই দায়িত্ব; অন্যের নয় ভেবে এ কাজকে পুরোপুরি সীমিত না রাখা। কারণ তারাও মুখাপেক্ষী অন্যের উপদেশের।

পরিবারের ক্ষেত্রে যেমন, এতে এমন কেউ নেই যে তার সদস্যবর্গকে পিতার অজ্ঞাতে চুপিসারে অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে। যেমন, তাদেরকে সমগ্র পরিবারের কল্যাণে দমন বা পীড়নের

ভয় ছাড়া পরামর্শ, নিজস্ব চিন্তা বা মতামত দানের অনুমতি প্রদান করা। এতে দেখা যাবে তার কিছু মতামত অপক্ক, কিছু ভাষা শিষ্টাচার পরিপন্থী। তথাপি তা পরিবার ও পরিবার প্রধানের জন্য ‘সব কিছু মনের মতো’ নামের কল্পনার রাজ্যে বাস করার চেয়ে শ্রেয়। যা মূলত অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার নামান্তর। কারণ, উন্মুক্ত আচরণের মধ্য দিয়ে গুরুতর হয়ে ওঠার আগে অপরিণত বয়সেই তার ভুলচুক সম্পর্কে জানা যায়। ফলে অবকাশ থাকে তা শুধরে দেওয়ার। পক্ষান্তরে যা অজ্ঞাতে-অগোচরে চলছে তা তো নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের যথাযথ পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া বেড়ে ওঠা ক্যান্সারের মতো।

অন্যকথায়, ভয়াবহ ক্ষতি ডেকে আনা গুপ্ত দোষ পুষে রাখার চেয়ে ঢের ভালো ব্যক্ত হলেই বাতাসে মিলিয়ে যাবে এমন ঈষৎ ক্ষতি মেনে নেয়া। সুতরাং কোনো কল্যাণ অর্জন হয় না নিছক মোকাবেলা ছাড়া। এ দৃষ্টান্ত যেকোনো মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সঠিক চাই তা ছোট হোক বা বড়।

ইসলামে দাসত্ব বলতে কী বুঝায়?

ইসলামের আবির্ভাবকালে বিশ্বসমাজে যুদ্ধবন্দিদের দাস বানিয়ে নেয়ার রেওয়াজ চালু ছিল।[২৭] ইসলামের আগমনের পরও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এ রেওয়াজ অব্যাহত ছিল। সুতরাং ইসলাম যখন শত্রুদের সঙ্গে

তাদেরই অনুরূপ আচরণ করতে গিয়ে যুদ্ধবন্দিকে দাস বানানোর অনুমতি প্রদান করে যাতে মুসলিমরা তাদের শত্রুদের মোকাবেলায় কোনঠাসা না হয়ে পড়ে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এ দাবির সপক্ষে লক্ষণীয় যে, সে যুগে তৎকালে দাস বানানোর বৈধ নানা উৎস ছিল, সেসবের মধ্য থেকে ইসলাম শুধু যুদ্ধবন্দিকেই গোলাম বানানোর অনুমতি দিয়েছে।[২৮] তবু এ উৎসকে জায়েয বা বৈধ বলেছে; ওয়াজিব বা জরুরী বলেনি। অর্থাৎ যুদ্ধবন্দিকে দাস বানানো আবশ্যক করা হয় না। বরং মুসলিম বিচারক বা মুসলিম সরকারকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে গোলাম বানিয়ে নেওয়া,

মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া কিংবা মুক্তিপণ ছাড়াই[২৯] তাদের স্বাধীন করে দেওয়ার মধ্যে যেকোনো সুযোগ গ্রহণের। ফলে যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে আচরণের আন্তর্জাতিক রীতিনীতি পরিবর্তনের সঙ্গে ইসলামের ভ্রাতৃত্বের মূলনীতিতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ এসেছে।

ইসলামের প্রকৃত মর্ম হলো, দাসত্ব কেবল আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত। একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই সবার মালিক। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক দাসত্বের নয়, ভ্রাতৃত্বের। মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য নিরূপিত তাকওয়ার মানদণ্ডে। আর

তাকওয়া একটি ব্যক্তিগত অর্জন। মানুষ বা সৃষ্টিজীবের পক্ষে পার্থিব জীবনের কোনো নিশ্চিত গুণ দেখে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় কাউকে তাকওয়া দান করা বা এর উত্তরাধিকার বানানো।[৩০] এ জন্যই ইসলাম দাস-দাসীর সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাদেরকে আখ্যায়িত করেছে আপন মুনিবের ভাই হিসেবে। শুধু তাই নয়। বরং তাদের বংশকে ‘ওয়ালা’[৩১] পদ্ধতির মাধ্যমে মুনিবের বংশের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। সম্পর্কের মর্যাদার দিক দিয়ে যা প্রায় স্বংশীয়ের মতো। এমনকি তাদের অনেকে মাত্র কয়েক যুগের ব্যবধানে নিজ মুনিব সম্প্রদায়ের

শাসক ও পরিচালকে পরিণত হয়েছে।[৩২]

তাছাড়া ইসলাম দাসপ্রথাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে স্বীকার করে না। বরং একে ব্যতিক্রমী অবস্থা বলে গণ্য করে। এ অবস্থা বদলাতে ইসলাম প্রজ্ঞার সঙ্গে কাজ করেছে। যাতে লোকসমাজে সম্পর্কের প্রচলিত নিয়ম ও বিদ্যমান বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। এ কারণেই ইসলাম স্থায়ীভাবে দাসপ্রথা নির্মূলে প্রয়োজনীয় বিধি ও আইন প্রণয়ন করেছে। দাসত্বের একমাত্র বৈধ উপায় বন্ধ হবার পর ইসলাম নানা উপায়-উপলক্ষে দাসত্বের নিয়ম তুলে দিয়েছে। এসব উপায়ের মধ্যে

রয়েছে বিভিন্ন পাপের কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) স্বরূপ প্রদেয় তিনটি সুযোগের প্রথমটি করা হয়েছে গোলাম আযাদ করা। তেমনি যে দাস তার দাসত্বের মূল্য পরিশোধ করে স্বাধীন হতে চায় তাকে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, এমনকি বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তা পরিশোধের অবকাশ পর্যন্ত দিয়েছে। গোলাম আযাদ করাকে বড় নেকির কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম ঘোষণা করেও দাসত্ব নির্মূলের পথ সুগম করেছে। শুধু তাই নয়, যে বাদী তার মুনিবের সন্তান জন্ম দিয়েছে মুনিবের মৃত্যুর পর তার মুক্তিপ্রাপ্তিও নিশ্চিত করেছে।[৩৩]

লক্ষণীয় বিষয় হলো, পাপের দায়মুক্তির ক্ষেত্রে দাস মুক্তিই কিন্তু একমাত্র বিকল্প নয়, বরং এ ক্ষেত্রে গোলাম আযাদ করা, মিসকীনকে আহার করানো অথবা সাওম পালন করার সুযোগও রাখা হয়েছে।[৩৪] কারণ, দাস-দাসী কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। কেননা এমন দিন আসবে যখন কাফফারা ওয়াজিব-ব্যক্তি মুক্ত করার মতো কোনো দাসই খুঁজে পাবে না।

রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে ইসলাম

যেকোনো ব্যবস্থাই গড়ে ওঠে দু'টি উপাদান সহযোগে: আদর্শ বা মূলনীতি এবং কর্মপন্থা বা কর্মসূচি। ইসলাম

সামাজিক সংগঠন (বিশেষ সংস্থা ও ফাউন্ডেশন) এবং রাজনৈতিক সংগঠনের (দল ও সাধারণ সংগঠন) পালনীয় মূলনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো আচার বা কর্মসূচি দেয় না। এটিকে সংশ্লিষ্ট যুগ ও স্থানের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। যাতে তারা নিজেদের প্রয়োজন ও বাস্তবতার আলোকে তাদের কর্মসূচি ও লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে।[৩৫]

এ মূলনীতি প্রত্যেক স্থান ও কালের উপযোগী। কারণ তা মানুষের সহজাত ও মৌলিক সকল উপাদানের প্রতি লক্ষ্য রাখে। আসলে প্রায় ক্ষেত্রে সেটিই উত্তম কর্মপন্থা বিবেচিত হয় যা

বিদ্যমান নীতি ও নিত্য পরিবর্তনশীল প্রয়োজনের পারস্পরিক প্রভাবের সমন্বয়ে গঠিত হয়। পারস্পরিক এই প্রভাবের হার জীবনের পর্বের বিভিন্নতা ভেদে বিভিন্ন রকম হয়। আর রাজনৈতিক সংগঠনের বেলায় কথাটি অন্যসব ক্ষেত্রের চেয়ে বেশি প্রযোজ্য।

ইসলাম সংঘবদ্ধতা ও সংগঠনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। তেমনি গুরুত্ব প্রদান করে দলের প্রধান নির্বাচনে। যদিও তা অন্যুন দুই সদস্যের দল হয়। ইসলামের এ গুরুত্ব ফুটে ওঠে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় এবং দু’জন সফর করলেও তাদের মধ্যে একজনকে নেতা

নির্বাচনে উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে। অনুরূপ মুসলিমদের জামা‘আতে সম্পৃক্ত হতে এবং এক কালেমায় সমবেত হতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ﴾ [آل عمران: ١٠٣]

“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩]

সর্বসাধারণকে কল্যাণ-কাজে পরস্পরের সহযোগী হতে অনুপ্রাণিত করতে গিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ﴾ [المائدة: ٢]

“সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ২]

ইসলাম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গেও পরস্পর কল্যাণকর্মে সহযোগিতার শিক্ষা দেয়। এর সবচে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মদীনায় ইয়াহূদী ও মুশরিকদের সঙ্গে সম্পাদিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধি চুক্তি।[৩৬]

অমুসলিমদের সঙ্গে সদাচারের প্রতি

তাগিদ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨﴾ [الممتحنة: ٨]

“দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।” [সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৮]

মূলনীতির দিক থেকে ইসলাম ও অন্য রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে সাদৃশ্য ও সাযুজ্যপূর্ণ অনেক দিক রয়েছে। তবে ইসলামী ব্যবস্থায় খ্রিস্টধর্মীয় ব্যবস্থার সঙ্গে কিছু দিকের এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের সঙ্গে অন্য কিছু দিকের পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যের প্রধান দিকগুলো নিম্নরূপ:

১. মধ্যযুগে খ্রিস্টধর্মের নামে চালু থাকা রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি ছিল মূলত মানুষ-সম্বন্ধীয়। তবে তা ঐশী গুণের পূর্ণ ধারকও ছিল। বিচারকই ছিলেন সেখানে বিধান প্রণেতা ও চূড়ান্ত বিধাতা। পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যবস্থায়

বিচারক ও বিচারপ্রার্থী উভয়ই যথোচিত পন্থায় স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহর আইনের প্রতি বিনীত। অর্থাৎ ইসলামে এরা উভয়ে মৌলিকভাবে শরী'আতে রব্বানী বা আল্লাহর বিধানের কাছে দায়বদ্ধ। হ্যা, মানুষকে সালিশি নিযুক্ত করার অবকাশ দেওয়া হয়েছে সীমিত পর্যায়ে আইনের বিস্তারিত প্রয়োগ অথবা স্রষ্টার সঙ্গে বক্তব্যের সম্পৃক্ততা নিয়ে মতবিরোধ কিংবা বক্তব্যের মর্ম অনুধাবন, ঘটনা নির্ণয় বা ফয়সালা প্রয়োগ নিয়ে মতানৈক্যের ক্ষেত্রে।

২. নাস্তিক্যবাদী গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়

সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে আইন প্রণয়নের ভার ছেড়ে দেয়া হয়েছে। চাই তা সত্য, কৃত্রিম বা প্রবঞ্চনাপূর্ণ হোক না কেন। এতে ধর্মকে শুধু আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদাত-বন্দেগী পর্যন্ত সীমিত রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যবস্থায় আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত-বন্দেগী ও বিচার-আইন (যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে) সবগুলোই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মহাবিশ্বের স্রষ্টার প্রতি বিনীত। প্রতিটিই পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এসে সমর্পিত। কুরআন-সুন্নাহে প্রাজ্ঞ এবং মানব-জীবনের প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ হক্কানী আলিমগণ এসবের বিধি-বিধান প্রণয়ন করেন।

পাশাপাশি এও বলা যায়, বিন্যস্ত গঠনমূলক সমালোচনা (যা আসলে ‘সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ’-এর অন্তর্ভুক্ত) একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। সম্মিলিতভাবে এ কাজ পরিহারের কোনো অবকাশ নেই। অপরদিকে গণতন্ত্রে অবিন্যস্ত সমালোচনা ব্যক্তির এমন অধিকার, যা সে ছেড়ে দিতে পারে।

তেমনি ইসলামী ব্যবস্থায় শূরা (মতামত দিয়ে অংশগ্রহণ) যোগ্যতা তথা শরী‘আত বা বিচার সংক্রান্ত জ্ঞানে গভীর ব্যুৎপত্তিনির্ভর। এ দুই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেই কেউ শূরার সদস্য হতে পারেন, চাই তিনি পুরুষ

হোন বা নারী আর ছোট হোন বা বড়। এক কথায় এখানে মানদণ্ড হলো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পারদর্শিতা। পক্ষান্তরে গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কর্তৃত্ববানরা[৩৭]। অতপর তাতে যোগ্য-অযোগ্যের পার্থক্য ছাড়া আপামর সাবালক ব্যক্তি ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এই মুষ্টিমেয় লোক কখনো অধিকাংশ ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করেন, কখনো করেন না। এদিকে সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেন শক্তিশালী ধনিক শ্রেণী। কখনো আড়াল থেকে কখনো প্রকাশ্যে।

তবে ইসলাম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনেক নীতির প্রশংসাও করে। যেমন এর চিন্তা-মতামত-অনুভূতি প্রকাশ তথা বাকস্বাধীনতা; কিন্তু এর শর্ত হলো তা ইসলামের শিষ্টাচার নীতির পরিপন্থি না হতে হবে। এর মাধ্যমে কেউ আহত বা অপমানিত না হতে হবে। ফলে এ স্বাধীনতা সে বাস্তব অবস্থা শনাক্তকরণে কাজে আসবে যা আমরা করি বা যার সঙ্গে আমরা পরিচিত। আর ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত বা সুনির্দিষ্টকরণ ছাড়া তো কোনো সিদ্ধান্ত বা সুষ্ঠু সমাধানেই পৌঁছানো যায় না।

ইসলাম তেমনি গণতন্ত্রের কিছু পদ্ধতিকেও মূল্যায়ন-সমর্থন করে।

যেমন গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতি; যদি তা হয় চূড়ান্তভাবে বা পদ্ধতিগত দিক থেকে বৈধ। যাবৎ না তা শরী‘আতের ‘সাওয়াবিতে’ তথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে। যেমন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত শরী‘আতের বক্তব্যের বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে কিংবা ওয়াজিব বা হারাম কোনো বিষয় নিয়ে ভোটাভুটি করা। অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা আইন প্রণয়নের প্রাক্কালে ‘পরামর্শে’র আওতার ব্যাপকায়নে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অবলম্বিত বৈধ সকল উপায় কাজে লাগাতেও উৎসাহিত করে ইসলাম।

অন্য দৃষ্টিকোণে, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা প্রধানত শক্তি ও দরাদরির লড়াই-নীতিনির্ভর। যে বেশি শক্তিমান, দর কষাকষিতে যে অধিক পারদর্শী, সে-ই এতে লাভবান হয়। এ ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় তদুপরি বাইরের কোনো পর্যবেক্ষণের অবিদ্যমানতায় রাজনৈতিক সংঘাতের ময়দানে চাতুর্যপূর্ণ অবৈধ পন্থা ব্যবহার করে অনায়াসে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করা যায়। অবশ্য যেসব মানুষ কপট সিদ্ধান্ত নিতে পারে অথবা তাদের প্রতারিত করতে পারে তাদের কথা ভিন্ন। আর এ স্বার্থের বিজয় কিন্তু জাতির বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বার্থের নাম ভাঙ্গিয়েই কামানো সম্ভব। যদিও

তা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের সম্মতির ভিত্তিতে; হোক সে সম্মতি কৃত্রিম বা প্রবঞ্চনাপূর্ণ।

পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যবস্থায় বিচার ব্যবস্থাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য হাসিলের একটি মাধ্যম বলে গণ্য করা হয়। এতে জবাবদিহিতা কেবল জনগণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং আল্লাহ তা‘আলাও থাকেন তাদের সঙ্গে পর্যবেক্ষক হিসেবে। তেমনি এখানে হিসাব শুধু পার্থিব জীবন এবং মানুষ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না। মানুষের সামনে অপরাধী ব্যক্তি কখনো নির্দোষ সাব্যস্ত হলেও আল্লাহ তা‘আলা তার প্রকৃত অবস্থা

সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকেন। গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের জবাবদিহিতা কখনো ঐশী আইন থেকেও শক্তি সঞ্চয় করে এবং তা দর কষাকষি ও পরিতুষ্ট করতে শুধু মানুষের পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণকেও ছাড়িয়ে যায়।

জাতীয়তা ও ধর্মে বিভিন্নতা সম্পর্কে ইসলাম কী বলে?

ইসলাম তো সেই মদীনায় গড়ে ওঠা[৩৮] রাষ্ট্র থেকেই বিভিন্নতাকে রাজনৈতিক ঐক্যের অন্যতম উপাদান মনে করে এসেছে। তাইতো তাতে নানা জাতি (আনসার, মুহাজির ও ইয়াহূদী)

এবং নানা ধর্মের (মুসলিম, খ্রিস্টান, ইয়াহূদী ও মূর্তিপূজক) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল।

ইসলাম মানুষের ব্যক্তি-অধিকার ও সামষ্টিক অধিকার সংরক্ষণ করে, তারা সংখ্যাগুরু হোক চাই সংখ্যালঘু। এদের সবার সঙ্গে ইসলাম ভারসাম্য রক্ষা করে। তবে তাদের প্রত্যেকের যোগ্য পার্থক্যানুসারে। তাই দলকে যা দেয় ব্যক্তিকে তা দেয় না। যৌথ ব্যাপারগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠকে যেসব অধিকার দেওয়া হয় সংখ্যলঘিষ্ঠকে তা দেওয়া হয় না। কেননা সাধারণ ব্যাপারসমূহ যেখানে বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখা অসম্ভব অথচ সেখানে

একতা বজায় রাখাও অবশ্যক, তাতে সংখ্যাগুরুকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ ইসলাম একান্ত প্রয়োজন না পড়লে দলের প্রয়োজনের চেয়ে ব্যক্তির প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দেয়।[৩৯]

বস্তুত ইসলামের প্রাথমিক যুগগুলোতে ব্যবহৃত পরিভাষা ‘যিম্মী’ শব্দটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে আধুনিক যুগে বহুল প্রচলিত পরিভাষা ‘সংখ্যালঘু’র প্রায় সমার্থ বুঝায়। শব্দদ্বয়ের মধ্যে একমাত্র তফাত হলো, যিম্মী পরিভাষাটি ধর্মীয় পার্থক্য নির্দেশ করে। পক্ষান্তরে সংখ্যালঘুর অর্থ

আরও ব্যাপক। কখনো জন্মসূত্রে গুণ যেমন রক্ত-বংশের প্রতি আবার কখনো অর্জিত গুণ যেমন ভাষা ও ধর্মের বিভিন্নতার প্রতি নির্দেশ করে।

ব্যক্তি পর্যায়ে (যেমন, ইবাদাত) ও নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে (যেমন, বিবাহ ও উত্তরাধিকার) ইসলাম সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগুরু বিরচিত সংবিধানে প্রদত্ত সাধারণ নীতির আলোকে যোগ্য অধিকার প্রদান করে।

তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের প্রদেয় ‘জিযিয়া’কে বর্তমানের রাষ্ট্রীয় করগুলোর সাথে তুলনা করা

যেতে পারে। অথচ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের যে তাদের সম্পদের সর্বোচ্চ ৫% প্রদান করতে হয়, তা গণতান্ত্রিক দেশে প্রদেয় করের কিয়দাংশ মাত্র। উপরন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে নারী, শিশু, পাগল, দরিদ্র, বয়োবৃদ্ধ ও দুরারোগ্য ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এ জিযিয়ার আওতামুক্ত।[৪০]

ইসলাম সংখ্যাগুরুদের বিশেষত্ব মেনে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণেও বদ্ধপরিকর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

“জেনে রাখো, যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিতে থাকা ব্যক্তির ওপর যুলুম করবে, তার অধিকার হরণ করবে, তার ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপাবে বা তার অমতে কিছু নেবে, কিয়ামতের দিন আমিই তার বিবাদী হবো।” এখানে মু‘আহিদ বা চুক্তিতে থাকা ব্যক্তির অর্থ ব্যাপক। এতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তায় থাকা সব ব্যক্তিই অন্তর্ভুক্ত। চাই তিনি অমুসলিম নাগরিক হোন অথবা সে দেশেরই নাগরিক।[৪১]

মুসলিম শাসকদের এসব নীতি অবলম্বনের ফলেই মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোতে যুগযুগ ধরে অমুসলিমরা বসবাস করছে বরং সেখানে তারা স্থায়ীভাবে আবাস গড়েছে অথচ সেসব দেশের শাসনদণ্ড ছিল মুসলিমদের বাদশাদের হাতে। এরই সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হিন্দুস্তান বা ভারতবর্ষ, যেখানে প্রায় সাত শতাব্দী রাজ্য পরিচালনা করেছে মুসলিরা অথচ তার কোনো নাগরিককেই ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় না। এ জন্যই এতে অবাক হবার কিছু নেই যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা তাদের হিন্দু ধর্ম নিয়েই সংখ্যগরিষ্ঠ থেকে গেছে। আবার অন্যদিকে দেখা যায় দূরপ্রাচ্যের

দেশগুলোতে যেমন মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় কোনো মুসলিম সৈন্যদল অভিযান পরিচালনা করেনি অথচ এর অধিকাংশ বাসিন্দাই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে।[৪২] শুধু তাই নয়, একসময় উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোই খ্রিস্টানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ পলায়নপর ইহুদীদের সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল।[৪৩]

ইসলামে মানবিক সম্পর্ক

ইসলাম দায়িত্বপ্রাপ্ত (মানব ও দানব) সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের প্রতি আহ্বান করে। এমনকি ইসলামকে যে আখিরাতের মুক্তির পথ

হিসেবে স্বীকার করে না তাকেও। যাবৎ না সে ইসলামের অনিষ্ট সাধনায় লিপ্ত হয় কিংবা মুসলিমদের ওপর যুলুম করে বা যুলুমকারীকে সাহায্য করে।

কারণ, ইসলাম তার সঙ্গে সদাচারের মূলনীতিতে অটল থাকে। ইসলাম পৃথিবীর নশ্বর জীবনে সম্মিলিত কল্যাণ বাস্তবায়নে অমুসলিমদের প্রতিও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে উৎসাহিত করে। যাবৎ না এ সহযোগিতা মুসলিমের চিরস্থায়ী জীবনের জন্য নেতিবাচক কিছু বয়ে আনে। আল্লাহ তা‘আলা জন্মগতভাবেই মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব প্রোথিত করেছেন। তিনি বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣﴾ [الحجرات: ١٣]

“হে মানুষ, আমরা তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।” [সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ১৩]

আর মুসলিম-অমুসলিমের সাধারণ সম্পর্কের সীমা নির্ধারণ করে আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণী,

﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨ إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٩﴾ [الممتحنة: ٨، ٩]

“দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয়

আল্লাহ ন্যায় পরায়ণদের ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দিয়েছে ও তোমাদেরকে বের করে দেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারাই তো যালিম।” [সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৮-৯]

অন্যভাষায়, ইসলাম (জিন্ন ও ইনসান তথা মানব ও দানব) সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত মাখলুককে দুনিয়া-আখিরাতের শান্তি অর্জনে একে

অপরেরে সহযোগী হতে উদ্বুদ্ধ করে।[৪৪] আমরা যেমন জানি শান্তি মানে প্রত্যেকটি জ্ঞানসম্পন্ন মানুষকে অন্যেরে জবরদস্তি ছাড়া নিজেকে সুখী বানাতে কাজ করার সুযোগ দেওয়া। হ্যাঁ, কেউ তার কাঙ্ক্ষিত শান্তি বা তার চেয়েও উত্তম শান্তি অর্জনে সহযোগিতা করলে সেটা ভিন্ন কথা। কারণ, তা জবরদস্তির অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ থেকে আমরা দু’টি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা বুঝতে পারি:

১. প্রাকৃতিকভাবেই মানুষেরে মধ্যে এক ধরনেরে পার্থক্য বিদ্যমান। এমনটি করা হয়েছে যাতে একে অপরকে

চিনতে পারে এবং পরস্পর সহযোগিতা-প্রতিযোগিতা করতে পারে। তবে ‘প্রকৃত অর্জনে’র মানদণ্ড তাকওয়া, অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা করা। আর তা করতে হবে তাঁর নির্দেশিত কাজ সম্পাদন এবং নিষেধকৃত কাজ বর্জন করার মাধ্যমে।

২. যৌথ ক্ষেত্রগুলোর অধিকাংশতেই মানুষের মধ্যে কিছু ভিন্নতার উপস্থিতি পারস্পরিক সহযোগিতার পরিপন্থী নয়। বরং যৌথ ক্ষেত্রগুলোতে তারা পরস্পরে সহযোগিতা করবে। এভাবে তারা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ও চিরস্থায়ী

আখিরাত জীবনের সৌভাগ্য বাস্তবায়নে যথাসম্ভব একজনের চেষ্টায় অন্যজন পরিপূরকের ভূমিকা রাখবে।

ইনসাফের জায়গা থেকেই ইসলাম নিরপেক্ষ বা সমর্থক অমুসলিম এবং শত্রু ও বিদ্বেষী অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করে। প্রথম দল নিজেদের দেশকে শান্তিরাষ্ট্র আর অপরদল নিজেদের দেশকে শত্রুরাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করে। তবে জাতিসংঘের মতো একটি অভিভাবক সংস্থা থাকতে উচিৎ ছিল তার সদস্য রাষ্ট্রের সবগুলোই শান্তিরাষ্ট্র হওয়া। যদিও কিছু ব্যতিক্রম থাকাও অসম্ভব নয়,

কখনো বাস্তবতা যাকে আংশিক বা সাময়িকভাবে হলেও অস্বীকার করে।

সাধারণত এই নির্ধারণের প্রশ্নটি পারিপার্শ্বিকতা ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এদিকে ইসলামে এই শ্রেণীকরণের যোগ্যতা রাখেন ব্যক্তি বা বিচ্ছিন্ন দল নয়; বরং (ওলিয়ে আমর বা) কর্তৃপক্ষ তথা সমগ্ররাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবকপক্ষ। কারণ ব্যক্তি ও দলের দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়তো আন্তরিকতার অভাব থাকে না; কিন্তু তাতে ব্যাপকতার অভাব থাকে ঠিকই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয় আবেগাশ্রিত এবং সমস্যার প্রতি

আংশিক নজরনির্ভর। তাই প্রায়শই তা ইসলামের বিশুদ্ধ মতামত থেকে হয় বিচ্যুত। তা কখনো সমগ্র উম্মাহ বা এর কোনো বিশাল অংশকে ইসলাম ও মুসলিমের অকল্যাণের দিকে টেনে নিয়ে যায়। বরং তাদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। পরবর্তীতে এই আবেগাশ্রয়ীদের অনেকেই অনুশোচনায় দগ্ধ হন। আর এমনটাই স্বাভাবিক। কেননা প্রায়োগিক ফিকহী সিদ্ধান্ত সঠিক হওয়ার জন্য শুধু শরী'আতের বাণীসমগ্রের ওপর পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়; এর জন্য আরও প্রয়োজন বাস্তবতা অনুধাবনের মতো যথেষ্ট প্রজ্ঞা।

বিষয়টি পরিষ্কারের জন্য গাযওয়ায়ে উহুদ হতে পারে আদর্শ উপমা। এ যুদ্ধে যুবক শ্রেণি তাদের ধর্মীয় আবেগ আর ইসলামের জন্য প্রাণদানের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে শত্রুদের অবস্থান অভিমুখে বেরিয়ে আসাকেই মুসলিমদের জন্য শ্রেয় মনে করেছিলেন। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি ছিল আরও ব্যাপক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। দীর্ঘমেয়াদে কাজের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং মুসলিম ও শত্রু সৈন্যের কথা বিবেচনা সেটিই ছিল বাস্তব ও যথার্থ সিদ্ধান্ত। লক্ষণীয়, যুবশ্রেণীর সিদ্ধান্ত ছিল কেবল দীনের আত্মনিবেদনের আবেগ ও প্রেরণা

থেকে উদ্ভুত। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত ছিল ইসলামের প্রতি তাঁর দায়িত্ব এবং ইসলাম ও মুসলিমের ভবিষ্যৎ ও তাদের নিরাপত্তার চেতনায় পুষ্ট। আর বলাবাহুল্য যে এ দুই সিদ্ধান্তের মাঝে বিদ্যমান বিশাল পার্থক্য।

তবে এর অর্থ কিন্তু এ নয় যে রাষ্ট্রের কিছু কিছু সিদ্ধান্ত কেবল ক্ষমতাবানদের ব্যক্তি স্বার্থের পদলেহনেই করে, হোক না তা ইসলাম ও মুসলিমের হিসেবে। বরং এসব সিদ্ধান্তের সিংহভাগই অধিক দূরদর্শিতা, অধিক সতর্কতা ও অশুভ

পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রেখে গৃহীত হয়।

আন্তধর্ম সংলাপ বিষয়ে ইসলামের অবস্থান

কিছু ধর্মের লোক আছে যারা অন্যধর্মের লোকদের সঙ্গে আলোচনা করতে ভয় পায়। বর্তমানে যাকে ‘আন্তধর্ম সংলাপ’ বলা হয় একে তারা এক ধরনের পরাজয় বলে মনে করে। এটি ঠিক নয়। সাধারণত আন্তধর্ম সংলাপ অথবা সঠিক শব্দে বললে ধর্মীয় প্রতিনিধিদের পারস্পরিক আলোচনা চার ধরনের হতে পারে[৪৫]:

১. সংলাপে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ধর্মের শুদ্ধতার স্বীকৃতি সংক্রান্ত পারস্পরিক আলোচনা। এটি প্রচারধর্মী সকল ধর্মেই যেমন ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মে প্রত্যাখ্যানযোগ্য। এর মধ্যে সরাসরি উভয় ধর্মকে প্রচলনের সবধরণের যৌথ প্রচেষ্টাই অন্তর্ভুক্ত। যদিও তা হয় উভয় পক্ষের অনিচ্ছায়।

২. বাস্তবে এসব ধর্মের অস্তিত্ব সম্পর্কে, ধর্মীয় বিরোধ থেকে সৃষ্ট বিরোধ নিরসনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে, এসব মতবিরোধ নিরসনের উপায়ে পৌঁছার জন্য যদ্বারা সবপক্ষের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে

এবং যৌথ ব্যাপারগুলোতে ফলপ্রসূ সহযোগিতা বাস্তবায়িত হবে- সে বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনা। ইসলাম এ উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। এর কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. প্রত্যেক ধর্মের লোকের অন্যকে নিজ ধর্ম সম্পর্কে তা দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ বাস্তবায়নে সক্ষম সে বিষয়ে নিশ্চিত করার চেষ্টা। আমরা যদি সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতী চেষ্টা সম্পর্কে চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাই দাওয়াতের উদ্যোগ ছিল মূলত এ ধরনের আলোচনার প্রথম পদক্ষেপ। আর এটি সকল নবী-রাসূল এবং সত্যের প্রতি আহ্বানকারী সবার দায়িত্ব।

সুতরাং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নানা ধর্মের প্রতিনিধি ও অনুসারীর সঙ্গে সংলাপ-আলোচনা মূলত প্রত্যেকের বিশ্বাসকে সত্য প্রমাণ করার এক দারুণ উপলক্ষ্য। এটি সংলাপে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে অন্যের ধর্মের সত্যতা নিয়ে ভাবার চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করে।

৪. বিভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনে চলমান বিভিন্ন লেনদেনের মাধ্যমে পারস্পরিক স্বতস্ফূর্ত আলোচনা। এতে উভয় পক্ষ ঐচ্ছিক বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাচনিক বা শারীরিক ভাষা ব্যবহার করেন।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান

বর্তমানে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও জাতিসংঘের নানা অঙ্গসংস্থা ও সংগঠন আয়োজিত বিচিত্র সম্মেলন অধিকারহারা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় নানামুখী প্রশংসনীয় তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

তবে এসব কখনো কখনো এমন কিছু আইনী ও রাজনৈতিক ইস্যু উসকে দেয় যা জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন এসব সংগঠন নিজেকে স্থানীয় আইনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে যা কেবল সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকদের ওপর প্রয়োগ করা হয়।

অথচ এরা বা এদের অধিকাংশই আইনটি প্রণয়ন করেছে।

এসব সংগঠনে কর্মরত অধিকাংশ ব্যক্তির আন্তরিকতার ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দেখা যায় তাদের অনেকে উদ্যমীর নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগে কখনো এমন নসীহতও পেশ করে যা ঐ জাতির দুনিয়া-আখিরাতের পথচলার সিদ্ধান্তের অধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলা যায়। তাতে ঐ জাতির স্বাধীনতার ওপর সুস্পষ্ট হস্তক্ষেপ করা হয় যারা স্বতস্ফূর্তভাবে জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জন করেছে। এর সঙ্গে আরও যোগ করা যায়, কিছু

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তাদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এসব সংগঠনেও অবৈধ অনুপ্রবেশ করে। তাদের চেষ্টা থাকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক নষ্ট করা এবং বক্রপথে জাতিসংঘের মূলনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। শেষাবধি যাতে এর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থাকে তাদের হাতে। বিষয়টি আমাদের সামনে কিছু প্রশ্ন তুলে ধরে:

১. এসব সংস্থা ও সম্মেলনের শক্তির উৎস কোথায় যারা জাতির ওপর ছুড়ি ঘোরাবার প্রয়াস পায়? জাতি কি তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে

নাকি কমপক্ষে অধিকাংশ জনগণ তাদের নির্বাচিত করেছে?

২. সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশের সিদ্ধান্তের বৈধতা কী? তারা যখন নির্দিষ্ট কোনো জাতির বৈধ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করবেন তখন তাদের সিদ্ধান্ত কি প্রতিনিধি নিযুক্তকারী জাতির অধিকাংশের সিদ্ধান্তের উর্ধ্বে হবে?

৩. যদি তারা নির্বাচন বা ভারার্পণের মাধ্যমে জাতির প্রতিনিধিত্ব না করেন, তাহলে কোনো আইনের ভিত্তিতে তারা জাতির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলান?

§ তারা কি জাতিসংঘের নীতির ভিত্তিতে নাক গলান? সদস্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের নাক গলানো তো জাতিসংঘের প্রধান মূলনীতিরই লঙ্ঘন যা সদস্যদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করে।[৪৬]

§ তারা কি গণতন্ত্রের নীতির ভিত্তিতে নাক গলান? তাদের এ কাজ তো গণতন্ত্রের মূলনীতিরও পরিপন্থী। কেননা গণতন্ত্র একটি জাতির সর্বোচ্চ ক্ষমতা সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে ন্যস্ত করে।

§ নাকি তারা মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে নাক গলান? তাদের অধিকাংশ সিদ্ধান্তই তো

মানবাধিকার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চেতনার ওপর বড় আঘাত।

এসব সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে নীতিগতভাবে কোনো জাতিই বাধ্য নয়, যাবৎ তার সদস্যবৃন্দ আইনী পন্থায় কোনো জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যথায় এটি শুধু সুপারিশ ও কিছু ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বলেই গণ্য হবে।

ইসলাম সাধারণভাবে ‘কে করলো’ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে মজলুমদের সমর্থনে ব্যয়িত সকল প্রচেষ্টার প্রতিই শ্রদ্ধা ও সমর্থন ব্যক্ত করে। উপরন্তু এ ধরনের কাজে অংশ নিতে সর্বাত্মক উৎসাহ যোগায়।

যদিও সে নিগৃহীত গোষ্ঠীটি হয় অমুসলিম।[৪৭] তাই যেসব ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হয় সেখানে এসব সংগঠনকে খবরদারি করতে ইসলাম নৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ করে। এসব ক্ষেত্র নিম্নরূপ:

১. যখন কোনো দেশ অন্য দেশের ওপর উৎপীড়ন চালায়। বিশেষত জাতিসংঘের উদ্ভবের পর।

২. যখন কোনো দেশ অন্য দেশের জাতি-গোষ্ঠী অথবা তার কিছু নাগরিককে স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক আইনের দোহাই দিয়ে নিগৃহীত করে। অন্যকথায়, যখন আইন প্রয়োগে নাগরিক ও অনাগরিকের মধ্যে কিংবা

নাগরিকদের মধ্যে বংশ বা পৈতৃক গুণাবলির কারণে বৈষম্য করা হয়। বিশেষতঃ জাতিসংঘের উদ্ভবের পর।

৩. যখন কোনো দখলদার গোষ্ঠী নির্দিষ্ট কোনো ভৌগলিক এলাকার আদিবাসীদের সম্পদ বা ভূমি জবরদখল করতে উদ্যত হয়।

৪. যখন রাষ্ট্র কিছু নাগরিককে তার জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। যেমন, তাদের ভূসম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সামর্থ্যমতো নিজ কর্ম বাছাইয়ের অধিকার, পছন্দমত স্থানে বসবাসের অধিকার ইত্যাদি। হ্যাঁ, তবে তা হতে হবে এসব অধিকার অর্জনের গ্রহণযোগ্য নিয়মানুসারে।

কল্যাণ প্রচারে আগ্রহ

চিন্তা, আকীদা ও মাযহাবগত নানা দল-উপদল রয়েছে যারা কেবল নিজেদেরে আদর্শকেই দুনিয়া-আখিরাতেরে কল্যাণেরে জামিন মনে করে। তবে তারা তাদেরে কল্যাণেরে পথে অন্যকে শামিল করার ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব অনুভব করে না। তারা কাউকে আহ্বান করে না নিজেদেরে পথে। আবার কিছু দল রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে তাদেরে অবলম্বিত পদ্ধতিই পার্থিব জগতে বিশ্ব মানবতাকে রক্ষা করতে পারে। পারে আন্তর্জাতিকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। এরা নিজেদেরে আদর্শ অন্যদেরে কাছে প্রচার এবং তাদেরে জন্য তা

আবশ্যক মনে করে। এদিকে আরেকে দল আছে যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তারা যে আদর্শ লালন করে একমাত্র তা-ই মানুষের ক্ষণস্থায়ী ও চিরস্থায়ী জীবনের অফুরান মঙ্গল বয়ে আনতে পারে। আর যেহেতু তারা সমগ্র মানবতার কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করে তাই তারা তাদের চেতনা ও আদর্শ প্রচারে উদ্যমের সঙ্গে কাজ করে। তবে তারা কাউকে বাধ্য করে না। মুসলিমরা এ দলেরই অন্তর্ভুক্ত। তারা চায় মুকাল্লাফ বা আল্লাহর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিটি জীবই (জিন ও ইনসান) কল্যাণ পথে তাদের সহযাত্রী হোক। কিন্তু এ পথে তারা কাউকে বাধ্য করায় বিশ্বাসী নয়। আল্লাহ

তা‘আলা তাদেরকে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে ইসলামের দিকে ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥﴾ [النحل: ١٢٥]

“তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি

খুব ভালো করেই জানেন।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫]

মুসলিমরা ইসলাম প্রচারে আগ্রহী কেন?

মুসলিমরা একান্তভাবেই কামনা করে, মুকাল্লাফ বা আল্লাহর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিটি জীবই (জিন ও ইনসান) ক্ষণস্থায়ী ও চিরস্থায়ী জীবনের অনন্ত সুখের ঠিকানা খুঁজে পাক। শাশ্বত জীবন ও নশ্বর জীবনের মুক্তির বার্তা নিয়ে আগমনকারী হিদায়াতে রব্বানীকে একচেটিয়াভাবে নিজেদের করে নেয়াকে মুসলিমদের জন্য বিশেষভাবে হারাম ঘোষণা করেছে ইসলাম। বরং এ বার্তাকে সবার মধ্যে

ছড়িয়ে দেওয়া অত্যাবশ্যক করেছে। কেউ যাতে ইসলাম থেকে, ইসলামের আলোকিত পথ থেকে বঞ্চিত না হয়।

একইসঙ্গে ইসলাম মনে করে প্রতিটি জ্ঞানসম্পন্ন বা সাবালক নারী-পুরুষই পৃথিবীতে স্বাধীন। সে যা ইচ্ছে তা গ্রহণ করতে পারে। যে চেতনা পছন্দ লালন করতে পারে। কিন্তু আখিরাতে এর ফল তাকেই ভোগ করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ﴾ [البقرة: ٢٥٦]

“দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত

স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৬]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿كُلُّ نَفۡسِۢ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِينَةٌ ٣٨﴾ [المدثر: ٣٨]

“প্রতিটি প্রাণ নিজ অর্জনের কারণে দায়বদ্ধ।” [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৩৮]

তবে কেউ যখন স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তার ওপর সেসব বাধ্যবাধকতা মেনে চলা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যা তার ওপর ইসলাম ফরজ করেছে। যাতে সে এসব না মানার শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। যোগ্য বিবেচিত হয়

আলাদা বৈশিষ্ট্য ও অফুরান প্রতিদানের।

ইসলামকে যিনি দীন হিসেবে গ্রহণ করবেন, তার জন্য জরুরি এর যাবতীয় শিক্ষা ও আদর্শকে বাস্তবে রূপ দান করা। কিছুকে ধারণ করা আর কিছুকে উপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই ইসলামে। যতক্ষণ তা হয় অকাট্য বা প্রায় অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং তার মর্ম হয় উপলব্ধ। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ﴾ [البقرة: ٨٥]

“তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৫]

বিষয়টি আসলে এমন, যেমন কেউ স্বেচ্ছায় একটি নির্দিষ্ট দেশের নাগরিক হলো। এখন কিন্তু সে ঐ দেশের নাগরিক হবার যাবতীয় শর্ত পূরণে বাধ্য। এসব শর্তের মধ্যে রয়েছে দেশের যাবতীয় অধিকার ও সুবিধাদি ভোগ করার জন্য প্রযোজ্য শর্ত

পূরণ করা। সে কিছুতেই এসব দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। কোনো দেশের নাগরিক হওয়া আর ইসলামের দীক্ষিত হওয়ার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই যে, নাগরিককে তার সম্পর্কের দেশ কখনো বিতাড়ন করে; কিন্তু মুসলিমকে তার একান্ত ইচ্ছে ছাড়া কেউ কখনো ইসলাম থেকে খারিজ করতে পারে না।

সংশ্লিষ্ট আরেকটি কর্তব্য হলো, মুসলিম নাগরিককে সমাজের কল্যাণে নিজের সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করতে হয়। যে সমাজের সে অংশ এবং তার বিবিধ সেবা সে গ্রহণ করে। তেমনি অমুসলিম নাগরিককে ইসলামী রাষ্ট্রের

জন্যও কিছু দিতে হয়। অন্যদের বেলায় আমরা বর্তমানে যাকে কর বা ট্যাক্স বলি এটি তার শামিল। যেমন, অমুসলিম দেশের মুসলিম নাগরিকদের নির্ধারিত ট্যাক্স বা কর পরিশোধ করতে হয়। যেমন, ভূমিকর, আয়কর ও বাণিজ্যিক কর ইত্যাদি। এসবের পাশাপাশি তাদেরকে সকল খরচ বাদ দেওয়ার পর (যার মধ্যে করও রয়েছে) যাকাতও দিতে হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রে অন্য ধর্মের তৎপরতা নিষিদ্ধ কেন?

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কিছু দেশে নিজ ভূখন্ডে অন্য ধর্ম ও মতবাদ প্রচার নিষিদ্ধ করেছে দু’টি প্রধান কারণে:

প্রথম. এসব দেশের সব বা অধিকাংশ নাগরিকই ধর্ম হিসেবে ইসলামকে বেছে নিয়েছে। আর ইসলাম এমন একটি ধর্মবিশ্বাস যার পূর্ণ আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী। এটি এমন শরী‘আত যা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও নির্ধারণ করে। ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস এমন:

১. মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা রয়েছেন। তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা। তিনিই শুরু এবং তিনিই শেষ।[৪৮]

২. স্রষ্টা কেবল একজন আর তিনি ছাড়া কেউই ইবাদাত বা উপাসনার যোগ্য নয়।

৩. সৃষ্টজীবের প্রয়োজন ও সমস্যা জানার জন্য তাঁর কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।

৪. আল্লাহ তা‘আলা মানুষ ও জিনকে কিছু গুণে ঋব্ধ করেছেন। যেমন, বিবেক-বুদ্ধি এবং ভালো-মন্দ পছন্দের একরকম স্বাধীনতা। উপরন্তু তিনি তাদেরকে সুস্থ প্রকৃতিতে এবং রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন, তাতে হিদায়াতে সুসজ্জিত করেছেন। ফলে তারা তাদের সাময়িক জীবনের যাবতীয় কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

অতপর তারা চিরস্থায়ী জীবনে তথা জান্নাত বা জাহান্নামে সেসব কর্মের ফলাফল ভোগ করবে।

৫. মুকাল্লাফ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত

প্রতিটি মাখলুক তথা জিন ও মানুষ যথাসাধ্য সর্বশেষ নবী মহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর প্রেরিত আল্লাহর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মানতে বাধ্য।

ইসলামের এসব মৌলিক বিশ্বাস জানার পাশাপাশি আমরা এও জানি যে বর্তমানের ধর্ম ও মতবাদগুলো ইসলামের এসব মৌলিক চেতনার কোনো না কোনোটি কিংবা একাধিক ধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আর এটা তো

অনস্বীকার্য যে, বিরুদ্ধ চিন্তার প্রসার নাগরিকদের নিরাপত্তাকে শুধু সাময়িক জীবনে নয়; চিরস্থায়ী জীবনেও হুমকির মুখে ঠেলে দেয়।

দ্বিতীয়. সাধারণত কোনো দেশের সব নাগরিক সাবালক হয় না। একটি দেশে অনেক নাগরিকই এমন থাকে যারা এখনো সাবালক হয় নি বা যাদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটে নি। এরা নিজেকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের আদর্শ ও চেতনা বিনাশী চিন্তা ও মতাদর্শ থেকে রক্ষা করতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন তাদের অপরের সহযোগিতা। মূলত তাদের সাহায্যার্থেই রাষ্ট্র এ ধরনের

ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। যেমন আমরা দেখি এদেশের যেসব নাগরিক সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অন্য দেশে বসবাস করছে, তাদেরকে সে দেশের নিয়ম মেনে চলতে হয়। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরে যে ব্যক্তি গবেষণার জন্য অনৈসলামি চিন্তা ও মতাদর্শ সম্পর্কে জানতে চায় তার জন্য তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রই সে ব্যবস্থা করে দেয়।

এটি একটি স্বাভাবিক বিষয়। কেননা আন্তর্জাতিক সনদসমূহও মানুষের শিক্ষার অধিকারের মধ্যে পিতা বা বৈধ অভিভাবকের জন্য সন্তানের শিক্ষার

বিষয় পছন্দ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।[৪৯]

তেমনি এও স্বাভাবিক যে অনেক রাষ্ট্রই তার রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে এমন সব তৎপরতা নিষিদ্ধ করে যাকে সে দেশে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোয় অশুভ এবং তার আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নাগরিকের নিরাপত্তায় প্রভাব সৃষ্টিকারী মনে করে। যদিও এসব কার্যক্রমের প্রভাব কেবল সাময়িক পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। সব দেশেই এমনটি করে থাকে। এমনকি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলোও। অতএব যেসব চিন্তা ও কর্মের প্রভাব শুধু

দুনিয়ার সাময়িক জীবন পর্যন্ত সীমিত নয়; বরং আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবন পর্যন্ত প্রলম্বিত তার ব্যাপারে কেন এমন নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে না? আর যেহেতু এর ক্ষতিকারিতা আখিরাতের অবশ্যম্ভাবী জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত ফলে তা জাতিসংঘের নীতিরও সমার্থক। কেননা জাতিসংঘ তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ধর্মীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর।

যদিও অনৈসলামি ধর্মীয় মতবাদ প্রচার-তৎপরতা নিষিদ্ধ থাকে তথাপি সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে তার অমুসলিম নাগরিকদের নিজেদের বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং

তাদের ধর্মীয় বিধিবিধান পালন ও বাস্তবায়নের পূর্ণ অনুমতি দিয়ে থাকে। যাবৎ তা সংখ্যাগরিষ্ঠের বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়। একমাত্র মক্কা নগরীই এর ব্যতিক্রম। ইসলামের বিশেষ পবিত্র স্থান হিসেবে এর প্রবেশাধিকার কেবল মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত।

সৌদি আরবে অন্য ধর্মের প্রকাশ্য চর্চা নিষিদ্ধ কেন?

এ বিষয়ে কথা বলার আগে আমাদেরকে মৌলিক কয়েকটি বিষয়ে একমত হতে হবে:

১. জাতিসংঘের সদস্য হওয়া কিংবা এর কোনো কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অর্থ কি এই যে, একটি জাতি তার নিজস্ব ভূখন্ডের ভেতের সে বা তার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যে মূল্যবোধ বা চেতনা লালন করে, তাকে পরিহার করতে হবে?

অবশ্যই এর উত্তর হবে: না। ধর্মনিরপেক্ষসহ সব দেশেই এ অধিকার সংরক্ষণ করে। কেননা জাতিসংঘ সনদ তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলছে:

‘পারস্পরিক সমানাধিকার ও প্রত্যেকের নিজস্ব চলার পথ পছন্দের অধিকারের ভিত্তিতে জাতিতে জাতিতে

সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।’[৫০]

এই সনদে এমন কিছু নেই যা জাতিসংঘকে কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবার অনুমোদন দেয়। তাতে এমন কিছুও নেই যা তার সদস্য দেশগুলোকে সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরে এ নীতি অন্তরায় নয় বলে এ সনদের কার্যকারিতা স্থগিত করার জন্য এ ধরনের সমস্যা উদ্ভাবনের অনুমতি প্রদান করে।[৫১]

২. কোনো ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও কি সংখ্যালঘু নাগরিকদের

তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা বা বিশ্বাস-আদর্শ সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক করার অধিকার রয়েছে? অবশ্যই এর উত্তর হবে: না।

৩. কোনো সাধারণ গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক দেশে কি বিদেশিদের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে- যারা সেখানে শিক্ষা, চাকরি বা রাজনৈতিক আশ্রয়ের সুবাদে অবস্থান করছে? নিশ্চয় তারা সে দেশের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ যে দেশ তাকে ভিসা প্রদান করেছে। তেমনি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তার মেয়াদ শেষ বা চুক্তি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত কি উভয়পক্ষের সম্মতি

ছাড়া কোনো শর্ত যুক্ত করার অনুমতি আছে কি?

অবশ্যই এর উত্তর হবে: বিদেশি ব্যক্তি স্বেচ্ছায় চুক্তি সম্পাদনপূর্বক একটি দেশে প্রবেশের পর কেবল সে দেশের আইন-কানুন মেনেই সেখানে অবস্থানের অধিকার রাখে। এ ব্যক্তি ও দেশটি কেবল চুক্তি সম্পাদনের আগ পর্যন্তই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শর্তাবলিতে সম্মতি বা অসম্মতি দেওয়ার অধিকার রাখে। আর স্থানীয় সব আইন পরোক্ষ শর্তের অন্তর্ভুক্ত। হ্যা, চুক্তিপত্রে যদি কোনোটাকে ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করা হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

সোজা কথায় বললে, একজন বিদেশি নাগরিক চাই তার বিশ্বাস ও মূল্যবোধ অবস্থানরত দেশের মূল্যবোধের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হোক বা না হোক, স্বেচ্ছায় চুক্তি সম্পাদনের পর তার জন্য জরুরী চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেদেশের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। এটি একটি স্বাভাবিক বিষয়। গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষসহ সব দেশেই এমনটি করে থাকে। এর দৃষ্টান্ত অনেক। যেমন,

১) কোনো বিদেশি শিশু যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে, তার জন্য আমেরিকান পাসপোর্ট ছাড়া

সেদেশে প্রবেশের অধিকার থাকে না। যদিও এ পাসপোর্ট বহন করার ফলে মানুষকে তার দেশের নিয়মে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। তবে বিদেশির জন্য শুরু থেকেই আমেরিকায় প্রবেশ না করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে যাতে তিনি আমেরিকান পাসপোর্ট বহনে বাধ্য না হন।

২) গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মতো সব দেশেরই নানা রকমের ভিসা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সুতরাং যিনি যে ধরনের ভিসা নিয়ে দেশে প্রবেশ করবেন তাকে তার যাবতীয় নিয়ম ও শর্তাদি মেনে চলতে হবে। যেমন, তিনি এ দেশে কেবল লেখাপড়া করবেন, কাজ করবেন

না এবং কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবেন না। একজন ভিনদেশী লোক এসব শর্তে সম্মতি প্রকাশ করার আগ পর্যন্ত পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে নিজের ভালো-মন্দ বিবেচনা করেন। তারপর সেসব তিনি মেনে নেওয়া বা না মানার ভিত্তিতে ভিসা গ্রহণ করেন বা তা থেকে বিরত থাকেন। কোনো পর দেশই তাকে ভিসা নিতে বাধ্য করে না।

৩) অনেক মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিম রাষ্ট্রের (তাদের ভাষায়) সে দেশের জাতীয়তা নিয়ে বসবাস করেন। তথাপি তারা সেখানে তাদের ধর্মীয় অনেক বিধি-বিধান সেখানে পালন করতে পারেন

না। যেমন, স্বপ্রণোদিত হত্যাকারীর ওপর কিসাসদণ্ড প্রয়োগ, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বেত্রাঘাতদণ্ড প্রয়োগ ইত্যাদি। কেননা এসব বিধান সেসব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক কর্তৃক গৃহীত আইনের পরিপন্থী। এদিকে ইসলামের দৃষ্টিতে এসব বিধান যদিও মৌলিক ও অবশ্য পালনীয়; কিন্তু একটি উদারনৈতিক ও বাস্তবমুখী ধর্ম হিসেবে ইসলাম এসব মুসলিমের বিধানগুলো বাস্তবায়ন না করাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। বরং তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট দেশের আদর্শ ও নিষ্ঠাবান নাগরিক হতে। অনুপ্রাণিত করে তাদেরকে অন্যের জন্য অনুকরণীয় হতে।[৫২]

স্বদেশী হিসেবে অমুসলিম দেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু মুসলিমকে যখন এমন নির্দেশনা হয়েছে, তখন বলাইবাহুল্য যে, বিদেশে অবস্থানকারী ব্যক্তির জন্য সে দেশের নিয়ম-কানুন মেনে চলা আরও বেশি আবশ্যক। নিয়ম মানতে না পারলে তো চুক্তি বাতিলের অবকাশ নিয়ে ঐ দেশে বসবাস ত্যাগ করতে পারে। সে হিসেবে নিয়ম পছন্দ না হলে শুরু থেকেই কেউ সৌদি আরবে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। সৌদি সরকার তো কাউকে এখানে আসতে বা বসবাস করতে কাউকে বাধ্য করে না।

আর কূটনৈতিক মিশনগুলোর ক্ষেত্রে এ নিয়ম এজন্য যে, তারা এখানে স্থায়ী নন। তাদের অবস্থান বারবার পরিবর্তন হয়। তাছাড়া তাদের ধর্ম ও ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাও ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন রকম হয়। সুতরাং তাদের ইবাদতের জন্য সুরম্য স্থাপনা প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া কূটনৈতিক নিয়মেও যুক্তিসঙ্গত নয়। কূটনীতির দাবি হলো, তারা তাদের সংরক্ষিত স্থানে নিজস্ব ধর্মীয় আচার-নিয়ম চর্চা করবেন। কূটনৈতিক শিষ্টাচারের দাবি উভয় রাষ্ট্র পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখবে। আর এরই অংশ হিসেবে স্থানীয় নিয়ম-নীতির প্রতিও শ্রদ্ধা রাখতে হবে।

সৌদি আরবের জনগণ ইসলামকে তাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। নিজেদের জন্য তারা ইসলামের যাবতীয় আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত-বন্দেগী, আচার-আখলাক ও বিধি-বিধানকে পছন্দ করেছে। এদিকে সৌদি আরবের ভৌগলিক অবস্থানকে ইসলাম বিশেষ সুরক্ষিত স্থান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে।[৫৩] আরব উপদ্বীপ যেখানে বিশ্বমুসলিমের প্রিয়তম ভূমিদ্বয় তথা মক্কা ও মদীনা অবস্থিত- তাতে দুই ধর্ম একত্রিত হতে পারবে না মর্মে নির্দেশ জারি করেছে। অর্থাৎ সেখানে সরকারি ও প্রকাশ্যভাবে দুই ধর্মের ইবাদাত করা যাবে না। তাই সৌদি সরকার যা

সে দেশের মুসলিম জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে তারও দায়িত্ব এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। এ ব্যাপারে সৌদি সরকারের কোনো বিকল্পের এখতিয়ার নেই।

অমুসলিমদের পবিত্র মক্কায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞাও এর অন্তর্ভুক্ত, যাকে সামনে রেখে সারা বিশ্বের মুসলিম নামাজ আদায় করে। এটি আসলে ঠিক এরকম যেমন সব দেশেই এমনকি গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে পর্যন্ত সরকারি ও বিশেষায়িত সংস্থাগুলোর সামনে ‘প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত’ লেখার রেওয়াজ প্রচলিত। বিভিন্ন কারণে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

যেমন, নিরাপত্তা জনিত কারণে, অস্থিরতা থেকে সতর্কতা হিসেবে এবং পবিত্রতা ও সম্মান রক্ষার্থে। যেমনটি প্রযোজ্য ইসলামের ক্ষেত্রে। কেননা অস্বীকারকারীদের পবিত্র মক্কায় প্রবেশ ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অবিশেষায়িত লোকদের উচিৎ অন্যের ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখানো।

এমনকি এ ব্যাপারে অনুরূপ কিছু করার দাবিও ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী। কেননা আপনি কারও কাছে তার বাড়িতে প্রবেশাধিকারের দাবি জানাতে পারেন না এর ভিত্তিতে যে আপনি তাকে আপনার বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন।

আর যেহেতু আপনি তাকে আপনার বাড়িতে প্রবেশের আগে এ শর্ত করেনে নি। অতএব, এ ব্যাপারে প্রতিটি মানুষ তার প্রয়োজন ও অভিরুচি মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন।

ইসলাম সন্ত্রাস ও উগ্রতাকে প্রত্যাখ্যান করে

অনেকে রাজনৈতিক নেতা ও চিন্তাবিদই আরবী ‘উনফ’ বা ‘সহিংসতা’ (Violence) শব্দ ও ‘ইর‘আব’ বা ‘আতঙ্কসৃষ্টি’ (Terrorism) শব্দের মধ্যে, তেমনি ‘উনফ’ বা ‘সহিংসতা’ ও ‘আল-ইর‘আব আল-উদওয়ানী’ বা ‘আগ্রাসন’ শব্দের মধ্যে এবং ‘উনফ’ বা ‘সহিংসতা’ ও ‘আল-ইর‘আব আয-

যরূরী’ বা ‘ত্রাস’ শব্দের মধ্যে পার্থক্য করেন না।

বস্তুত বিদেশি শব্দ সন্ত্রাস বা Terrorism-এর আরবী প্রতিশব্দ ‘ইরহাব’ নয়; ‘ইর‘আব’। কেননা (‘ইরহাব’ শব্দের ধাতুমূল তথা) ‘রাহ্ব’ (الرهب) শব্দ ও তা থেকে নির্গত শব্দাবলি পবিত্র কুরআনে ত্রাস নয় বরং সাধারণ ভীতি-সঞ্চার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতে একটি নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অর্থ মিশে থাকে। অন্যের বেলায় মানুষ শব্দটি ব্যবহার তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবার জন্য।[৫৪] আর এ শব্দ কিন্তু ‘আর-

রু‘ব’ (الرعب) শব্দ থেকে ভিন্ন অর্থ বহন করে। কেননা ‘রু‘ব’ শব্দের অর্থ তীব্র ভীতি-সঞ্চার অর্থাৎ ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা।[৫৫] মানুষ এ শব্দটিকে ব্যবহার করে অন্যকে শায়েস্তা করা এবং তাদের ওপর যুলুম চালানোর জন্য। আবার এর কতক সংঘটিত হয় উদ্দেশ্যহীন, অনির্দিষ্ট ও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে।[৫৬]

তবে এতদসত্ত্বেও ‘ইরহাব’ ও ইর‘আব’ শব্দ আরবী ভাষায় ধাতুগতভাবে শুধু মন্দ বা শুধু ভালোর জন্য ব্যবহৃত হয় না। এদু’টি এমন মাধ্যম যা ভালো বা মন্দের পক্ষাবলম্বন করে না। উভয় শব্দ সত্য

প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধ এবং নিপীড়িতের সাহায্যার্থে ব্যবহৃত হয়। তেমনি শব্দদু’টিকে নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষের ওপর অত্যাচার, অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ও অধিকার হরণ এবং তাদের ভূমি দখলের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

তবে ‘উনফ’ ও ‘ইরহাব’ শব্দের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ‘উনফ’ অর্থ চিন্তা, মতবাদ, দর্শন কিংবা সাধারণ বা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রকাশে সহিংস মাধ্যম বা উপায় অবলম্বন করা। যেমন, আঘাত, শারীরিক নির্যাতন বা অস্ত্র ব্যবহার। পক্ষান্তরে ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ শব্দ দু’টি এর

চেয়ে ব্যাপক অর্থ বহন করে। কারণ, তা হতে পারে সহিংস উপায়ে আবার হতে পারে অহিংস উপায়ে। যেমন, আকার-ইঙ্গিতের মাধ্যমে ভয় দেখানো। (তাকে এভাবে ইঙ্গিতে জবাই করার ভয় দেখানো।) অথবা কথার দ্বারা ভয় দেখানো। যেমন, অর্থনৈতিকভাবে বয়কটের হুমকি, কঠোরতা আরোপের হুমকি, না খেয়ে মারার হুমকি কিংবা পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি ইত্যাদি। ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ শব্দদু’টি ভেটোর ক্ষমতা প্রয়োগ অথবা জালেমের নিন্দা প্রস্তাবে ভোট দেওয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করে। অসত্য অভিযোগ প্রচারের মাধ্যমেও ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ সংঘটিত হতে পারে। যেমন,

টার্গেট গোষ্ঠীর সুনাম ক্ষুণ্ণ করতে বা তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে অপপ্রচার ও প্রচলিত মিডিয়া যুদ্ধের কৌশল গ্রহণ করা।

এই ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ কখনো হামলার শিকার ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক হত্যা করে না। বরং তাকে দীর্ঘ শাস্তি ও ধারাবাহিক নির্যাতন করে ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে মারে। অর্থাৎ এ দু’টি কখনো তৎক্ষণাৎ না মেরে ধীরে ধীরে মৃত্যু ডেকে আনে। এটি করা হয় তাকে গৃহহীন অবস্থা ও ক্ষুধার মুখে ঠেলে দেওয়ার মাধ্যমে।

আমাদের চারপাশে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ব্যাপকার্থে যারা ‘ইরহাব’ ও

‘ইর‘আব’ করছে- যার মধ্যে রয়েছে সত্য প্রতিষ্ঠা করা ও নির্যাতন প্রতিরোধ করা অথবা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া ও অত্যাচারীকে আশ্রয় দেওয়া- এরা প্রধানত তিন দলে বিভক্ত। যথা:

১. যারা নীতি-নৈতিকতার বাইরে গিয়ে শব্দ দু’টিকে ব্যবহার করে তাদের নির্যাতন বা অন্যায়কে বৈধতা দেবার জন্য। আখিরাতে বিশ্বাসী হোক বা না হোক- এরা মানবস্বভাব ও ঐশী শিক্ষার বিরোধী। যার মধ্যে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শও রয়েছে।

২. যারা যথাসাধ্য প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে থেকে শব্দদু’টি ব্যবহার করে

আত্মরক্ষা কিংবা অক্ষম ও নিরপরাধ লোকদের থেকে যুলুম প্রতিরোধের উদ্দেশে। তারা আখিরাত বা শাশ্বত জীবনে বিশ্বাস রাখে না। তারা এসব করে আল্লাহ প্রদত্ত সুস্থ বিবেকের তাড়নায়।

৩. যারা শব্দদু’টি ব্যবহার করে আত্মরক্ষা বা অক্ষম ও নিরপরাধ লোকদের ওপর যুলুম প্রতিরোধে যথাসম্ভব শরী‘আত ও প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে থেকে। তারা বিশ্বাস করে এজন্য তারা আখিরাত বা শাশ্বত জীবনে বিশাল প্রতিদান লাভ করবে। অতএব, তারা এসব করে সুস্থ বিবেক ও

অনন্ত জীবনের বিশাল প্রতিদানের প্রত্যাশায়।

এ জন্যই দেখা যায় শেষোক্ত দলটি আত্মোৎসর্গ ও আত্ম নিবেদনে সবচে বেশি আগ্রহী ও সাহসী হয়। কেননা তার দৃষ্টিতে পার্থিব জীবন কেবল উসিলা বা বিধেয় মাত্র; মাকসাদ বা উদ্দেশ্য নয়। সম্ভবত এটিই মানুষকে নিজেদের সম্মানিত স্থান, নিজেদের মাতৃভূমি ও নিপীড়িত স্বজনদের রক্ষায় প্রাণোৎসর্গমূলক জিহাদী কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

সাধারণভাবে আত্মঘাতমূলক তৎপরতার ব্যাপারে ইসলামের

দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের আইন ব্যাখ্যাকারী তথা ফকিহবিদদের মতভিন্নতা হতে বিভিন্ন হয়। তাদের অনেকে কাজটিকে বৈধ বলেন এবং এ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধও করেন। যতক্ষণ তা হয় আত্মরক্ষার্থে এবং অন্যায়ভাবে অন্যের ওপর সীমালঙ্ঘনের ইচ্ছে ছাড়া। উপরন্তু তা নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত না হয়, যাদের ওপর ইসলাম যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যন্ত হামলার অনুমতি দেয় না। যেমন, নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও নিরস্ত্র ব্যক্তি। অনুরূপভাবে সব রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই মানবরচিত আইন নিজের দৃষ্টিতে বৈধ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনোদেরকে জীবনের ঝুঁকি

নিতে এমনকি জীবন উৎসর্গ করতে পর্যন্ত উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে অনেকে শরী‘আতবিদ কাজটিকে আত্মহত্যার সঙ্গে তুলনা করে হারাম বলে অভিহিত করেন। তাদের মতে, জীবনের ঝুঁকি নেওয়া ভিন্ন জিনিস। কারণ সেখানে জীবন রক্ষার সম্ভাবনাই প্রবল। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণকারীর মৃত্যুর কোনো অভিপ্রায়ই থাকে না।

আসমানী রিসালত বা ঐশী বার্তাপ্রাপ্ত ধর্ম পালনকারী ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, দুনিয়ার এ জীবন মূলতঃ একটি পরীক্ষাতুল্য। এর মাধ্যমে চিরস্থায়ী জীবনে পুরস্কারযোগ্য সৎকর্মশীল

এবং অনন্ত জীবনে তিরস্কারযোগ্য অসৎ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য রচনা করা হয়। আর সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীর সংঘাত এবং নিপীড়ক ও নিপীড়িতের দ্বন্দ্ব এ পরীক্ষার একটি অংশ মাত্র। আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذۡكَرُ فِيهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗاۗ﴾ [الحج: ٤٠]

“আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ-

যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়”। [সূরা আল-হজ, আয়াত: ৪০]

‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ কখনো সংঘটনের ইচ্ছা ছাড়া সংঘটিত হতে পারে। ভুলক্রমেও হতে পারে কখনো। তবে এ ব্যাপারে তাকে সতর্ক করার পরও যদি সে এমন কাজ থেকে নিবৃত না হয়, যা ‘ইরহাব’ বা ‘ইর‘আব’-এর কারণ হয়, তখন তা ইচ্ছাকৃত ‘ইরহাব’ বা ‘ইর‘আব’ বলেই গণ্য হবে।

ইসলাম যেহেতু মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপক শান্তি কিংবা অন্তত নানা ধর্মের মানুষের মধ্যে শুধু দুনিয়ার শান্তির প্রতি আহ্বান জানায়। তাই এ ধর্ম অন্যের ওপর অত্যাচার বা

সীমালঙ্ঘনমূলক ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ সংঘটনকে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করে। তীব্রভাবে একে প্রত্যাখান করে এবং সীমালঙ্ঘন বা উৎপীড়নমূলক ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ এর জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করে।

হ্যাঁ, ইসলাম এতদুভয়ের অনুমতি দিয়ে ঠিক; তবে তা শাস্তিকে অপরাধী পর্যন্ত সীমিত রাখা এবং অনুমোদিত ক্ষেত্রের অতিক্রম না করার শর্তে। অনুমোদিত ক্ষেত্র হলো, আত্মরক্ষা, শত্রু দমন ও নির্যাতিতের সাহায্যের জন্য, বিশেষত যুলুম প্রতিরোধের কোনো ক্ষমতাই সেসব দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তির নেই। একেই

ইসলামে ‘জিহাদ’[৫৭] অথবা ‘কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ’ বলা হয়। যার উদ্দেশ্য কেবল নিরস্ত্র, অক্ষম ও দুর্বলদের থেকে যুলুম তুলে দেওয়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهۡلُهَا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥﴾ [النساء: ٧٥]

“আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে’ যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার

পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭৫]

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

«يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا»

‘হে আমার বান্দা, আমি নিজের ওপর যুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও একে হারাম করেছি। অতএব, তোমরা একে অপরের ওপর যুলুম করো না।’[৫৮]

এ কারণেই মুসলিমদের ক্ষেত্রে এমন বিচিত্র নয় যে তারা তাদের প্রজাসাধারণ (যিম্মি) বা সংখ্যালঘুদের বাঁচাতেও জিহাদ করছে।[৫৯] এককথায়, কারও ওপর যুলুম চালানোর জন্য নয়; ইসলামে ‘জিহাদ’ নামক বিধান রাখা হয়েছে বৈধ প্রতিরোধের জন্য। আর নির্যাতন প্রতিরোধের পদক্ষেপকে গণতান্ত্রিক ও অন্যান্য দেশের মানব রচিত সকল ব্যবস্থাই সমর্থন করে। এ উদ্দেশ্যেই তো সকল রাষ্ট্র শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে। নিজেকে সুসজ্জিত করে বিধ্বংসী সব অস্ত্র দিয়ে।

আত্মরক্ষামূলক এবং আক্রমণাত্মক ভীতিপ্রদর্শনের মধ্যে পার্থক্য করবো কীভাবে?

ইতোমধ্যে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে, ভীতিপ্রদর্শন ও ভয় দেখানো শব্দটিকে সন্ত্রাসী (জালেম) ও সন্ত্রাসের শিকার (মজলুম) উভয়েই ব্যবহার করে। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে আমরা এদুয়ের মধ্যে জালেম ও মজলুমকে পার্থক্য করবো কীভাবে?

আত্মরক্ষার্থে ভীতিপ্রদর্শন আর সন্ত্রাসমূলক ভীতিপ্রদর্শনের মধ্যে মোটাদাগে পার্থক্য এই:

অন্যের বিরুদ্ধে কে প্রথমে ত্রাস বা সন্ত্রাসের সূচনা করেছে? যে সূচনা করেছে সে চর্চা করছে আক্রমণাত্মক ভীতিপ্রদর্শন আর যিনি প্রতিরোধ করছেন তিনি হলেন আত্মরক্ষাকারী। একইভাবে যিনি জালেমকে বস্তুগত বা নৈতিকভাবে সমর্থন করবেন তিনি আক্রমণাত্মক ভীতিপ্রদর্শনকারীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন। পক্ষান্তরে যিনি মজলুমকে সাহায্য করবেন তিনি আত্মরক্ষাকারী বলে গণ্য হবেন।

এটা ঠিক সচরাচর সহজে সূচনাকারী শনাক্ত করা যায় না। কারণ, জালেমের পক্ষের গরিমা ও অহঙ্কার বেশি হয়। নিপীড়কের শক্তি হয় পর্বতপ্রমাণ।

এমনকি মজলুমের চেয়ে জালেমের প্রমাণও হয় দৃঢ়তর। তথাপি বিষয়টি অন্যভাবে খোলাসা করা সম্ভব।

তবে সূচনাকারী শনাক্ত করা মুশকিল হলে অন্যভাবে তা চিহ্নিত করা যায়। যেমন আমরা উভয় পক্ষের মধ্যে মিমাংসার চেষ্টা করে দেখবো। যে পক্ষ ইনসাফভিত্তিক সালিশের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাবে সে-ই জালেম, হোক সে মুসলিম। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩﴾

[الحجرات: ٩]

“আর যদি মুমিনদের দু’দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন”। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯]

সন্ত্রাস ও আগ্রাসী হামলা কখনো ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তা হলো,

অভিযোগ প্রমাণ না করেই কোনো মানুষকে শাস্তি দেওয়া। কিংবা কোনো ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ওপর নির্ভর করে একটি জাতিকে বা পুরো মানব সমাজকে শাস্তি দেওয়া। এ কাজ ইসলাম কিছুতেই সমর্থন করে না। শাস্তি দিলে তা অবশ্যই অনুমোদিত সীমা অতিক্রম না করতে হবে।

অভিযোগ প্রমাণের পরও শাস্তি থাকতে হবে যুক্তিগ্রাহ্য সীমারেখার ভেতর। পরন্তু শাস্তির প্রকৃতিও হওয়া চাই অভিন্ন। অত্যাচারী বা জালেমের ভিন্নতায় তা যেন ভিন্ন ভিন্ন না হয়। অতএব জালেম দুর্বল হলে বা মিত্র না হলে তার শাস্তি কঠোর হবে না। তেমনি জালেম শক্তিধর, মিত্র বা তার কাছে

কোনো স্বার্থ থাকলে তার শাস্তি লঘু করা হবে না। সর্বদা শাস্তি হবে ইনসাফের আলোয় উদ্ভাসিত। কেননা আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সর্বাবস্থায় ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨﴾ [المائدة: ٨]

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে,

তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৮]

তবে ইসলামের এসব সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকার পরও মুসলিম নামধারী অনেকে ইসলামের মহান আদর্শকে উপেক্ষা করে। আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ অমান্য করে তারা সন্ত্রাস ও আগ্রাসনের পথ বেছে নেয়। এটা স্বাভাবিক যে প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার নাগরিকদের সঠিক আচরণ শিক্ষা দেয়। তারপরও তো প্রত্যেক দেশেই

অপরাধীতে পূর্ণ অনেকে কয়েদখোনা থাকে। তাই বলে কি আমরা বলবো যে অমুক জাতি পুরোটাই অপরাধী? কিংবা অমুক জাতি তার সদস্যদের অপরাধ শিক্ষা দেয়? আমেরিকার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৮২-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৫টি অন্যায় হামলা বা সন্ত্রাস সংঘটিত হয়েছে। এর অধিকাংশ সংঘটিত হয়েছে খ্রিস্টান তারপর ইহুদিদের দ্বারা। তাই বলে কি আমরা বলবো সকল খ্রিস্টান বা সব ইহুদিই সন্ত্রাসী বা আগ্রাসী? অবশ্যই না।

ইসলাম কীভাবে সন্ত্রাস প্রতিরোধ করে

ইসলাম প্রধানত তিনি উপায়ে হুমকি, সন্ত্রাস বা বাড়াবাড়ির প্রতিরোধ করে:

প্রথমত: বাল্যকাল থেকেই সুশিক্ষা প্রদান করা। যুলুম ও বাড়াবাড়ি হারাম, এর প্রতিরোধ জরুরি এবং ন্যায় ও সাম্যের ঝান্ডাবাহী হবার চেতনায় গড়ে তোলা।

দ্বিতীয়ত: যেসব কারণ ও সমস্যা থেকে সন্ত্রাস ও সীমালঙ্ঘনের সূচনা সেসব নির্মূল করা। আর তা সবার প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, ন্যায় বিচার, ইনসাফের আচরণ, ভালো ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা এবং বৈষম্যহীনভাবে জীবনোপকরণ

সরবরাহের মাধ্যমে। এ জন্যই ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক দুর্ভিক্ষ ও মন্বান্তরের বছর চোরের হাত কাটার বিধান কার্যকর স্থগিত করা আশ্চর্যের কিছু নয়। এও বিচিত্র নয় যে তিনি কয়েকজন দাসকে ক্ষমা করে দেন যারা একটি উষ্ট্রী চুরি করে নিজেদের জঠর জ্বালা মেটাতে তা জবাই করেছিল। বরং তিনি তাদের মনিবকে তাদের অনাহারের রাখার জন্য ভৎর্সনা করেন। ঐ উষ্ট্রীর মূল্যও তিনি পরিশোধ করে দেন বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে।[৬০]

অতএব শুধু সন্ত্রাসের অভিযোগ আর একে অপরকে দোষারোপ পর্যন্ত সীমিত থাকলে হবে না। দুষ্কৃতকারী ও সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারির আগে এর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। তাও করতে হবে নির্মূল। আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অপরিকল্পিত ও এলোপাতাড়ি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে নিন্দা জানাই। যা নির্যাতিতকে কেবল নিরাশ ও হতাশ করে। প্রায় ক্ষেত্রেই যার শিকার হয় নির্দোষ ও নিরস্ত্র ব্যক্তি। অথচ তারা যে সন্ত্রাস ও আগ্রাসনের মোকাবেলা করে আসছে এবং হাজার হাজার নিরপরাধ লোক যার শিকারে পরিণত হচ্ছে, তাকে উপেক্ষা করা হয়।

সন্ত্রাসের শিকার কতিপয় দেশে কখনো সন্ত্রাসের জন্য অজ্ঞাত পক্ষকে দোষারোপ করে। অথচ এর কারণকে উপেক্ষা করে। ঘটিত সন্ত্রাস তো কখনো ঐ সন্ত্রাসের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াতেও হয়ে থাকে যার মাধ্যমে এ দেশে মূলতঃ শত্রুকে অব্যাহতভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছে। এসব দেশে কখনো সন্ত্রাস দমনে কঠিনতর পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করে এবং প্রকারান্তরে আগুনে ঘি ঢালে। অথচ একেবারে হাতের সমাধানকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে। আর কিছু নয়; সন্ত্রাসের উৎসগুলোকে বন্ধ করে দেওয়াই হাতের কাছের সমাধান।

কখনো দেখা যায় রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ তার বিভিন্ন বাহিনীর সূত্র (যেমন গোয়েন্দা বাহিনী বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রাণালয়ের কতিপয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিংবা বিদেশে কর্মরত আমলাদের) সরবরাহকৃত ভুল তথ্যের ভিত্তিতে তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এসব কর্মকর্তার উচিৎ প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনে আরও বেশি সচেষ্ট হওয়া। নিরপেক্ষ সূত্র ও সূত্রের সুবিস্তৃত ঘাঁটিগুলো কী বলছে তা জানা এবং সীমিত সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর নির্ভরশীল না হওয়া। কারণ, এ সূত্র কখনো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিভ্রান্ত করে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় বৈরী শক্তি তার

বেঁধে দেওয়া সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ গ্রহণে নানা উপায়ে চাপ প্রয়োগ করে। এই নিন্দনীয় ও অনৈতিক পন্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে ভুল তথ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করানো, অর্থ দিয়ে প্ররোচিত করা, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার মাধ্যমে কর্মকর্তাদের অবমাননাকর ও অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলা, অতঃপর তাদের মাধ্যমে তাদের হুমকি দেওয়া এবং অপরাধ সংগঠিত করে শত্রুদের দিকে তার দায় চাপানো।

এখানেই আসে জাতির বিদ্বান শ্রেণির ভূমিকার প্রসঙ্গ। তাদেরই কর্তব্য জাতি ও জাতীয় নেতৃত্বকে আলোকিত করতে প্রয়াসী হওয়া। যাতে তারা

কখনো রাতরে ষড়যন্ত্র, সূক্ষ্ম চক্রান্ত কিংবা ভাসাভাসা যুক্তিতে বিভ্রান্ত না হন। এসব শাসক জাতিকে অযৌক্তিক ও স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত হজম করতে এসব ব্যবহার করে থাকেন।

তৃতীয়ত: অন্যায় থেকে নিবারণ করে এমন শাস্তি নির্ধারণ করা। তবে এ শাস্তি নির্ধারিত হবে অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে অভিযুক্তকরণ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ জেরো-তদন্তের পর। সেখানে বিচারকের জন্য ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি অস্বীকার করারও অবকাশ থাকবে। কেননা তদন্তে অবহেলো করার পর নিরপরাধ লোকদের

ওপর শাস্তি প্রয়োগ অথবা অনুমোদিত সীমা ছাড়িয়ে প্রতিশোধস্পৃহা থেকে শাস্তি প্রদান প্রায় ক্ষেত্রেই প্রতিশোধমূলক এলোপাতারি সন্ত্রাস উস্কে দেয়।

কুরআন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কি সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ ডেকে আনে

পূর্বের উদ্ধৃতিগুলো থেকে যেমন আমাদের সামনে স্পষ্ট হলো, পবিত্র কুরআন মূলতঃ আন্তর্জাতিক শান্তি এবং মানুষের পার্থিব ও অপার্থিব জীবনের শান্তির প্রতি একটি আহ্বান। এটি তেমনি ধর্মীয় বিভিন্নতা সত্ত্বেও অন্যের অধিকার প্রদানে একটি আহ্বান।

যে ব্যক্তি উপযুক্ত জ্ঞান নিয়ে এ কুরআন অধ্যয়ন করবে, তিনি দেখবেন তাতে সকল মানুষের সঙ্গে সুকুমারবৃত্তি ও নান্দনিক আচরণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বরং তাদের প্রতি অনুগ্রহ-ভালোবাসা এবং দুনিয়া-আখিরাতের তাদের কল্যাণ বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨ إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٩﴾ [الممتحنة: ٨، ٩]

“দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় পরায়ণদের ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করছেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে আর তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করে দেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারাই তো

যালমি”। [সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৮-৯]

আল-কুরআনে অমুসলিম আত্মীয়-স্বজন এবং পিতামাতার হক আদায়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حُسۡنٗاۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَآۚ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٨﴾ [العنكبوت: ٨]

“আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে। তবে যদি তারা তোমার উপর প্রচেষ্টা চালায় আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদেরে

আনুগত্য করবে না। আমার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যা করতে আমি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবে”। [সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤ وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٥﴾ [لقمان: ١٤، ١٥]

“আর আমরা মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে

তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শির্ক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে”। [সূরা লুকমান, আয়াত: ১৪-১৫]

পবিত্র কুরআনে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যা মানুষের মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের আগ্রহ তুলে ধরে। আয়াতগুলো মানুষের প্রতি মানুষকে অকৃত্রিম ভক্তি-সম্মান প্রদর্শন করতেও উদ্বুদ্ধ করে। সর্বোপরি তা এমন শক্তিপুঞ্জের প্রশংসা করে যারা অন্যের ওপর যুলুম বা অসদাচরণ করে না।

পবিত্র কুরআনে আরও আছে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস। আছে যারা তাঁকে দাওয়াতের কারণে শত্রুতা দেখিয়েছে তাদের এবং তিনি ও তাঁর অনুসারীদের ওপর চলা

তেরো বছরব্যাপী নির্যাতন-অত্যাচারের ওপর কীভাবে ধৈর্য ধরেছেন তার বিবরণ। এরপরই কেবল আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আত্মরক্ষার্থে অত্যাচারীদের ওপর যেমন কর্ম তেমন ফল হিসেবে প্রতিরোধ করার অনুমতি দিয়েছেন।

পৃথিবীতে নানা বর্ণ-ধর্ম ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী কর্তৃক অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এসব পক্ষ-বিপক্ষ যোদ্ধা বহু রকমের কঠোর পন্থা অবলম্বন করেছে। যেমন, সহিংসতা, রক্তপাত, মানসিক, আত্মিক ও চৈন্তিক দমন-পীড়ন। এরা সবাই কি সন্ত্রাসী কিংবা সবাই কি আত্মরক্ষাকারী? এদের

সন্ত্রাস কি আত্মরক্ষার্থে ছিল না আগ্রাসন?

প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ফৌজি ও সামরিক স্কুল ও একাডেমি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকে। প্রতিটি জাতিই তার সৈন্যদের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রের দক্ষ ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। সামগ্রিকভাবে প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশগুলোই বেশি ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের অবকাঠামো উন্নয়নে অগিয়ে। এরাই পৃথিবীর নানা দেশে ও জাতির কাছে অস্ত্র বিক্রি করে। তাদের কাছে পৃথিবীর সবচে বেশি প্রশিক্ষিত

সেনাবাহিনী রয়েছে। আরও বেশি উন্নত প্রযুক্তির ধ্বংসাত্মক অস্ত্র আবিষ্কারে তাদের সমৃদ্ধ গবেষণাগার রয়েছে- এ কথা বলতে তারা গর্ব ও সম্মান বোধ করে। আমরা কি তাহলে সব ধরনের সামরিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা প্রয়োজন বলে দাবি করবো? আর সব রাষ্ট্রই কি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ লালন করছে? যেসব দেশে তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছে তারা সবাই কি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রতি তীব্রভাবে আগ্রহী?

অবশ্যই না। কেননা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই যুলুম বা অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধের

পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করাকে জরুরি মনে করেন। বিশ্বের প্রতিটি ঐশী ও মানবরচিত আইনও নিজের জীবন, সম্পদ, ভূমি ও ধর্ম রক্ষায় প্রতিরোধের অধিকার সংরক্ষণ করে।

সুতরাং যদি পবিত্র কুরআনে ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলিম ও তাদের শত্রুদের লড়াই-ইতিহাস আছে বলে তার শিক্ষা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের জন্ম দেয় বলে অভিযোগ করা হয়, তাহলে তো অন্য সব জাতির ইতিহাস পঠন-পাঠনও একই অভিযোগে অভিযুক্ত হবে। আমরা সেসব ইতিহাসে দেখতে পাই সে জাতির তীব্র গৃহযুদ্ধ ও অন্য জাতির সঙ্গে সংঘটিত রক্তাক্ত

লড়াইয়ের হাজারো গল্প-উপাখ্যান। তাই বলে কি আমরা এসব ঘটনা উগ্রবাদ ও চরমপন্থার বীজ বোপন করার অভিযোগে প্রত্যেক জাতিকে তার ইতিহাস শিক্ষাদান থেকে বিরত থাকতে বলবো? শুধু তাই নয়, বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলি এবং বিভিন্ন জাতির খেয়ালী যুদ্ধ ও কোনো দেশের নাগরিক বিভিন্ন দলের অনাকাঙ্ক্ষিত লড়াইয়ের ওপর নির্মিত অনেক চলচ্চিত্র এবং ডকুমেন্টারি ভিডিওও পাওয়া যায়। এসব ডকুমেন্টারি ফিল্ম তো বিভিন্ন ঘটনার নানা অপ্রকাশিত তথ্য ও অনেক বাস্তব সত্যও তুলে ধরে। তদুপরি তাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নানা জাতি-গোষ্ঠীর

মধ্যে বিদ্বেষ ও উগ্রতার বিষবাষ্প লুকিয়ে থাকে। তাই বলে কি এসব ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ করা উচিৎ? নাকি বাস্তবতাকে কলুষিত করা এবং কল্পনা ও দিবাস্বপ্নের ঘোরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্মাণ করা শ্রেয়?

এছাড়া অন্যান্য ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলোতেও এত বেশি এ ধরনের বাণী রয়েছে, যদি সেগুলোকে তার পূর্বাপর আলোচনা বাদ দিয়ে সংকলিত করা হয়, তাহলে নিশ্চিত তাকে সন্ত্রাস ও চরমপন্থায় প্ররোচিতকারী গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা যাবে। এর উদাহরণ আমরা দেখতে পাই বাইবেলের Old

Testament বা পুরাতন সমাচারে: ‘যখন তোমাকে তোমার প্রভু সেই ভূমিতে নিয়ে যাবেন যেখানে তুমি প্রবেশ করতে যাচ্ছো, তার মালিক হবার জন্য এবং তোমার সামনে আগত জাতগুলোকে বিতাড়ন করার জন্য। তারা সাতটি জাতি, যারা তোমার চেয়ে বেশি ও বড়। এবং যখন তোমার প্রভু তোমার সামনে তাদেরে দমন করবেন এবং তুমি তাদেরে আঘাত করবে, তখন তুমি তাদেরে সম্পূর্ণ অবধৈ ঘোষণা করবে। তাদের সাথে কোনো চুক্তি করবে না, তাদের ওপর কোনো দয়া দেখাবে না এবং তাদের কারো সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কেও জড়াবে না।’[৬১]

আরও যেমন রয়েছে, ‘এখন তোমরা প্রতিটি ছেলে শিশুকে হত্যা করো। যেসব নারী সম্পর্কে জানা যায় কোনো পুরুষের শয্যাসঙ্গী হয়েছে, তাদেরও হত্যা করো। তবে যেসব মেয়ে শিশু সম্পর্কে জানা যায় কোনো পুরুষ কর্তৃক ব্যবহৃত হয় নি, তাদের তোমরা নিজেদের জন্য জীবিত রাখো।’[৬২]

অনুরূপ New Testament বা বাইবেলের নতুন সমাচারেও এমন বাণী রয়েছে। যেমন, ‘তবে আমার যেসব শত্রু চায় না আমি তাদের ওপর কর্তৃত্ব দেখাই, তাদের তোমরা এখানে নিয়ে আসো

এবং আমার সামনে তাদেরে জবাই করো।'[৬৩]

তাহলে এসবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি বলবো গ্রন্থগুলো সন্ত্রাস ও চরমপন্থাকে উৎসাহিত করে? কিংবা গ্রন্থগুলো থেকে এসব বাণী মুছে ফেলা উচিৎ। অবশ্যই না। বাণীগুলো বিশেষভাবে পবিত্র। বরং এগুলোকে তার পূর্বাপর প্রেক্ষাপটসহ অধ্যয়ন করতে হবে। তাহলে এর মূল বাণী ও প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

ইসলামে নারী

ইসলাম তার শিক্ষা ও আদর্শের মাধ্যমে মানবপ্রকৃতিকে- যা দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন- সমর্থন ও শক্তিশালী করে। আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে দ্ব্যর্থহীন কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে নারী-পুরুষ দুই শ্রেণিতে সৃষ্টি করেছেন। এরা যাতে একে অপরের সম্পূরক হয়। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ঠিক রাত-দিনের মতো। যে দুয়ের সমন্বয়ে হয় একটি দিন কিংবা বলা যায় ইতি ও নেতিবাচক স্রোত তথা জোয়ার-ভাটার মতো, যে দুইয়ের যৌগে গঠিত হয় বিদ্যুৎ-শক্তি। এ বিদ্যুৎ-শক্তি সঞ্চার করে বহু জড় পদার্থে প্রাণ ও প্রাণস্পন্দন।

আল্লাহ তা‘আলা নারীকে যেসব অনন্য বৈশিষ্ট্যে শোভিত করেছেন তার অন্যতম হলো আচার-আচরণে আহ্লাদের প্রাচুর্য ও আবেগের বাহুল্য। তেমনি গঠন-প্রকৃতিতেও নারী কোমলতা ও এমন নম্রতায় সমুজ্জ্বল, পুরুষের সঙ্গে বসবাসরত পরিবেশে যা তার স্বাধীনতাকে করে সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তা‘আলা নারীকে স্বভাব-চরিত্রেও বানিয়েছেন কোমল। যাতে সে শুষে নিতে পারে পুরুষের যাবতীয় রুক্ষতা। কেড়ে নিতে পারে তার হৃদয়-অন্তর। নারীর সান্নিধ্য পুরুষকে দেবে মানসিক আশ্রয়। যেখানে এলে তার টেনশন-অস্থিরতা লঘু হবে। কেটে যাবে সব ক্লান্তি ও বিস্বাদ। একইভাবে সে

যাতে হয় মমতাময়ী এবং শিশুর লালন-পালনে উপযুক্ত। আবেগে ও অনুভূতিপ্রবণ এক কোমল সৃষ্টি নারী। অপরের সুখের জন্য নারীই পারে সবচে বেশি ত্যাগের মহত্ব প্রকাশ করতে। এসব মানবিক গুণ ও সহজাত উপাদান ছাড়া কোনো পরিবার ও সমাজ টেকসই হয় না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রমাণ করেছে, নারীই সবচে বেশি কঠিন মানসিক চাপ বহন করতে সক্ষম। মানসিক আঘাত সারাতে নারীই রাখতে পারে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা।

অন্যদিকে আল্লাহ তা‘আলা পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন রূঢ়তা ও কঠোরতা দিয়ে। যা তাকে স্থান ও কালের

বিবেচনায় বৃহত্তর অঙ্গনে বিচরণের সুযোগ এনে দেয়। মানুষ যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তা থেকে আত্মরক্ষায় শারীরিকভাবে পুরুষ অধিক সক্ষম। তাই শত্রু কর্তৃক তুলনামূলক সে কমই আক্রান্ত হয়। তেমনি তার মানসিক গঠনেও দৃঢ়তা বেশি। এ কারণে সে অনেক দুর্ঘটনার সামনেও অবিচল থাকতে পারে। যেমন অকস্মাৎ কোনো সরীসৃপ বা ভীমদর্শন প্রাণীর আবির্ভাব ইত্যাদি। এ জন্যই সে নারীর তুলনায় বেশি নিরাপত্তা ও সাহসিকতার সঙ্গে ভীতিকর, ঝুঁকিপূর্ণ ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে এগিয়ে যায়। এ কারণেই সে নিরব নিষুতি রাতেও আতঙ্ক জাগানিয়া নানা প্রান্ত

বীরদর্পে অতিক্রম করতে পারে। নিরাপদে ফিরে আসতে পারে স্বজনের কাছে। যা পারে না একজন নারী।

উল্লেখ্য, সাধারণত আমরা যখন পুরুষ বা নারীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করি, তা কিন্তু ব্যতিক্রম অবস্থার অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। কারণ, অনেক সময় নারীর বৈশিষ্ট্যের জায়গায় দেখা যায় পুরুষকে। যেমন, পুরুষের স্বকীয় স্থানে দেখা যায় নারীকেও।

পুরুষের তুলনায় নারীর মর্যাদা

নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত সম্পর্ক বিষয়ে এমন ব্যতিক্রমী বক্তব্যকে অনেকে প্রমাণ হিসেবে হাজির করেন,

সমান গুরুত্ব সত্ত্বেও প্রকৃতির ভিন্নতায় যার সম্পর্ক রাত-দিনের মতো। পূর্বাপর বিবেচনায় না এনে বক্তব্যকে ভুল বোঝার একটি সরল দৃষ্টান্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিচে উল্লেখিত বক্তব্য:

«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ. قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ بَلَى. قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا».

“হে নারী সম্প্রদায়, তোমরা বেশি বেশি সদকা করো। কেননা আমি তোমাদের বেশি জাহান্নামের অধিবাসী দেখেছি।’ মহিলারা বললেন, কেন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, ‘তোমরা অধিক হারে অভিশাপ দাও এবং স্বামীর অকৃজ্ঞতা দেখাও। (বুদ্ধিমান পুরুষকে নির্বুদ্ধি বানাতে) অল্প বুদ্ধি ও খাটো দীনদারির আর কাউকে তোমাদের চেয়ে অধিক পটু দেখি না।’ তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের জ্ঞান ও দীনের অল্পতা কী? তিনি বললেন, ‘মহিলাদের সাক্ষী কি পুরুষদের সাক্ষীর অর্ধেক নয়?’ তারা বললেন, জী, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ‘এটিই তাদের জ্ঞানের অল্পতা। যখন তাদের মাসিক

শুরু হয় তখন কি তারা সালাত ও সাওম বাদ দেয় না?’ তারা বললেন, জী, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ‘এটিই তাদের দীনদারির স্বল্পতা।’[৬৪]

এ বক্তব্যের প্রেক্ষাপট হলো, সেটি ছিল ঈদের দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইছিলেন তাদেরকে সদকা দানে উদ্বুদ্ধ করতে। বাস্তবে এটি ছিল এমন কথা বলে হাস্য-কৌতুক করার আদর্শ সময়, যা আংশিক সত্য। তা হলো, কিছু ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষী পুরুষের সাক্ষীর অর্ধেকের মর্যাদা রাখে এবং মাসিক অবস্থায় তাদের নামাজ পুরোপুরি ক্ষমা করা হয় আর রমজানের রোজা

অন্য সময় আদায় করতে হয়। দোষের ক্ষেত্রে গুণ বলে এখানে কৌতুক করা হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞানে ও দীনে কম হলে কী হবে বুদ্ধিমান পুরুষকে পর্যন্ত বোকা বানিয়ে ছাড়ে!

পক্ষান্তরে জাহান্নামে তাদের সংখ্যা বেশি হওয়া- তা তো স্বাভাবিক। কেননা, বাস্তবে তাদের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি। এছাড়া অন্য কারণও তো রয়েছে। এদিকে স্বামীর অকৃতজ্ঞতা তারাই বেশি প্রদর্শন করে থাকে। আসলে এটিই তো আবেগী মনের অপরিহার্য দাবি।

যাই হোক স্বাভাবিকভাবে ইসলামে পুরুষের মর্যাদার তুলনায় নারীর মর্যাদা তিন রকম:

ক. নারী যেসব অবস্থায় পুরুষের সমান:

ইসলাম নারীকে পুরুষের সহোদরা বানিয়েছে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলেছেন[৬৫]) এবং নারী-পুরুষকে একে অপরের শুভাকাঙ্ক্ষী বানিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা যেমন বলেন,

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾ [التوبة: ٧١]

“আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭১]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَ﴾ [النساء: ٣٢]

“পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩২]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧﴾ [النحل: ٩٧]

“যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلۡخَٰشِعِينَ وَٱلۡخَٰشِعَٰتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ

أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا ٣٥﴾ [الاحزاب: ٣٥]

“নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৫]

আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের জান্নাত থেকে বেরিয়ে আসার ঘটনার

রশে ধরে ইসলাম নারীর ওপর অর্ধেক দায়িত্ব দিয়েছে।[৬৬] বরং এ ব্যাপারে পুরুষই বড় দায়িত্ব বহন করে। কেননা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তার হাতে।[৬৭]

খ. যেসব অবস্থায় নারী পুরুষের চেয়ে ভিন্ন:

ইসলাম একজন মাতাকে পিতার চেয়ে বেশি হক দিয়েছে।[৬৮] যেমন সৌদি আরবে সরকারি চাকরিজীবি মায়েদের জন্য বার্ষিক ছুটির অতিরিক্ত প্রসবকালীন ছুটি হাদীসে বর্ণিত নিফাসের মেয়াদ[৬৯] অনুযায়ী কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশ দিন দেওয়া হয়। তেমনি তাকে পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত মেয়াদ[৭০] অনুযায়ী স্বামী

মারা গেলে বার্ষিক ছুটির অতিরিক্ত প্রায় একশ দিনের বিশেষ ছুটি দেওয়া হয়। অথচ পুরুষদের জন্য এ ধরনের কোনো ছুটির ব্যবস্থা নেই। একইভাবে ইসলাম নারীদের জন্য সোনা ও রেশমী কাপড় ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। পুরুষের জন্য দেয়নি। নারীদের মাসে প্রায় এক সপ্তাহ এবং বছরে প্রায় একমাস নামাজ মাফ করা হয়েছে, যা পুরুষের ক্ষেত্রে করা হয় না।

শুধু তাই নয়, নারীদের প্রতিপালনে ইসলাম যে মর্যাদা রেখেছে পুরুষদের জন্য তা রাখা হয় না। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«لاَ يَكُونُ لأَحَدِكُمْ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

‘তোমাদের যে কারও যদি তিনজন কন্যা বা বোন থাকে আর সে তাদের সুন্দরমত দেখাশুনা করে, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।’[৭১]

তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ»

“তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম”।[৭২]

এ হাদীসে স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহারকে পুরুষের চারিত্রিক মর্যাদার মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এখন আমরা কি বলবো যে ইসলাম পুরুষের বিপক্ষে বর্ণবৈষম্যকে প্রশ্রয় দিয়েছে?

গ. পুরুষের কিছু যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য:

পুরুষের ওপর ইসলাম পরিবারের নেতৃত্বভার অর্পণ করেছে এবং উত্তরাধিকারে তার অংশ বেশি দিয়েছে। কারণ, নারীর ভরণ-পোষণ তার দায়িত্বে। আর কিছু ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষীকে পুরুষের অর্ধেক গণ্য করেছে। বিনিময়ে তাকে এমন কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যা নারীকে দেওয়া হয় না।

পুরুষের ওপর পরিবারের আর্থিক ভার ন্যস্ত করা হয়েছে। পরিবারের মৌলিক অর্থিক খাতগুলো তাকেই সামলাতে হয়। আর তাকেই নিযুক্ত করা হয়েছে পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক।

আমরা দেখতে পাই, ইসলাম অনেক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে একইরকম অধিকার দিয়েছে। পাশাপাশি উভয়ের আলাদা বৈশিষ্ট্যও রেখেছে। এভাবেই ইসলাম উভয়ের মধ্যে সমতা বিধান করেছে। তবে এ সমতা দিনের সঙ্গে দিনের কিংবা রাতের সঙ্গে রাতের সমতার মতো নয়। বরং তা গুরুত্বের দিক দিয়ে রাত ও দিনের সমতার মতো। যেমন আদর্শ জীবন কিছুতেই

উভয়টিকে উপেক্ষা করতে পারে না। আর যেমন একটি দিবস রাত বা দিনের কোনোটির প্রয়োজনকেই উপেক্ষা করতে পারে না।

সাধারণভাবে আমরা যখন ইসলাম নিয়ে আলোচনা করি, তখন ইসলাম ও ইসলাম অনুসারী তথা মুসলিমদের আচরণের মধ্যে পার্থক্য মাথায় রাখা উচিৎ। ইসলাম ও মুসলিম দু’টি ভিন্ন জিনিস। কেননা মুসলিম অনেক সময় ইসলামী শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হতে পারে। মুসলিম নারীমাত্রেরই উচিৎ, পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার দাবি না করে ইসলাম তাকে যে অধিকারগুলো দিয়েছে তা দাবি করা। কেননা,

সমানাধিকার নীতিতে গেলে ইসলাম প্রদত্ত অনেক প্রাকৃতিক অধিকারও হারাতে হয়।

নারীর অবাস্তব সমানাধিকারের দাবিদাররা যার গান গায় আমরা যদি সেই ফরাসি বিপ্লবের নথিপত্র এবং গণতান্ত্রিক দেশসহ বহু দেশের সংবিধান ঘেঁটে দেখি, তাহলে দেখবো অনেক ক্ষেত্রেই তারা নারীর সেই অধিকারগুলোর স্বীকৃতি মাত্র সেদিন দিয়েছে, ইসলাম যা প্রতিষ্ঠা করেছে চৌদ্দশ বছর আগে! শুধু তাই নয়, বরং অনেক অধিকার এমনও আছে যার স্বীকৃতি আজো তারা দেয় না। যেমন, পরিবারে নারীর আর্থিক দায়িত্ব ক্ষমা

করা এবং তাকে যাবতীয় অর্থনৈতিক ভার থেকে অব্যহতি দেওয়া ইত্যাদি।[৭৩]

সুতরাং এসব বাস্তবতা সম্পর্কে অবগতির পরও কি কোনো জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম রমণী ইসলামের দেওয়া তার অধিকার ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে পদদলিত করে পশ্চিমাদের নারীদের তথাকথিত অধিকার দাবি করবেন?

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অবস্থান

ইসলামে নারীর অবস্থান তুলে ধরতে গিয়ে আমরা যে প্রাকৃতিক গুণাবলির

কথা তুলে ধরেছি, তা থেকে আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, নারী-পুরুষ উভয়েরই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাকে অন্যজন থেকে আলাদা করে। পাশাপাশি আমাদের সামনে এ কথাও পরিষ্কার হয়েছে যে, পুরুষরা যেসব গুণে অন্যন্য, প্রায় ক্ষেত্রেই তা তাকে বড় নেতৃত্বের যোগ্যতর করে তোলে।[৭৪] বিশেষত যখন এই কর্তৃত্বের জন্য প্রয়োজন হয় শাসন, বিচার ও ইজতেহাদের যোগ্যতা। আর অন্য ক্ষেত্রগুলোতে নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে শরিয়তবিদগণ নানা মত ব্যক্ত করেছেন। বিরোধপূর্ণ এই ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে বিচার, ‘হাসবা’ (সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে

নিষেধের জন্য সরকারি দায়িত্ব) এবং অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব। তবে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ইসলাম নারীকে দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য বিবেচনা করেছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর সবাই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে। ইমাম একজন

দায়িত্বশীল; তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ দায়িত্বশীল তার পরিবারের; সে জিজ্ঞাসিত হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে। মহিলা দায়িত্বশীল তার স্বামীর গৃহের; সে জিজ্ঞাসিত হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে। ভৃত্যও একজন দায়িত্বশীল, সে জিজ্ঞাসিত হবে তার মুনিবের সম্পদ সম্পর্কে। (এককথায়) তোমরা সবাই দায়িত্বশীল আর সবাই জিজ্ঞাসিত হবে সে দায়িত্ব সম্পর্কে।”[৭৫]

ইসলাম তেমনি নারীর সঙ্গে শলা-পরামর্শের গুরুত্বকেও উপেক্ষা করেনি। কেননা, রাব্বুল আলামীনের

রাসূল, যার ওপর অহী অবতীর্ণ হতো তিনিও তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। কুরাইশদের সঙ্গে সম্পাদিত শান্তিচুক্তিতে একটি ধারা সংযোজন করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, কুরাইশদের কেউ মুসলিম হয়ে মদীনায় গেলে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে। পক্ষান্তরে মুসলিমদের কেউ মক্কায় পালিয়ে এলে তাকে (মদীনায়) ফেরত পাঠানো হবে না। সাহাবীগণ কিছুতেই এ ধারা মেনে নিতে পারছিলেন না। তাদের কাছে এটি পরাজয়তুল্য মনে হচ্ছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম থেকে হালাল হতে

বললে সাহাবীরা ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকেন। এ সময় মুমিন জননী উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবীদেরে নির্দেশ না দিয়ে নিজে হালাল হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী হালাল হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের অনুসরণে সাহাবীরাও হালাল হয়ে যান।[৭৬]

কিছু বিচারে নারীর সাক্ষ্য পুরুষের অর্ধেক কেন?

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ...وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ

يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ
ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا
ٱلۡأُخۡرَىٰۚ﴾ [البقرة: ٢٨٢]

“হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের লেনদেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে...... আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু’জন সাক্ষী রাখ। অতঃপর যদি তারা উভয়ে পুরুষ না হয়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু’জন নারী- যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর। যাতে তাদের (নারীদের) একজন ভুল করলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেয়”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮২]

আয়াতটি বাকি লেনদেনকারীদের উদ্দেশে একটি সাধারণ নির্দেশনা। এদিকে যে সাক্ষ্যের ওপর বিচারক নির্ভর করেন আর যে সাক্ষ্যের মাধ্যমে চুক্তি অনুমোদনকালে হকদারের পক্ষে সুপারিশ করা হয়- এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা, প্রথম অবস্থায় ঘটনা সাক্ষ্যের বিশেষ শর্তাবলিকে বাধ্যতামূলক করে। যেমন, কিছু বিষয়ে আত্মীয় পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না অথচ সেখানে অনাত্মীয় মহিলার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হয়।

এর সাথে যোগ আরও বলা যায়, ইসলাম পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব

ন্যস্ত করেছে পুরুষের কাঁধে। তাই তাকে পরিবারের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে কেবল ঐ গুণগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে যা তাকে সরবরাহ করা হয়েছে; নারীকে সরবরাহ করা হয় না। আর যারা দায়িত্বশীল তাদের কথা ও মতামতের ওজন একটু বেশি থাকে, এটাই স্বাভাবিক। এমনকি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলোতেও তাই দেখা যায়। যেমন গণতান্ত্রিক দেশে যখন একটি বিষয়ে ভোট দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, তখন প্রেসিডেন্টের মতামতকে তার সঙ্গীদের অর্ধেকের মতামতের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়।

তাছাড়া যে প্রাকৃতিক ভিন্নতার দিকে ওপরে ইঙ্গিত করা হয়েছে তার আলোকেই দেখা যায় পুরুষ ব্যাপকতর পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারে। অনেক বিষয়েই পুরুষের সাক্ষ্য অধিক যোগ্য বিবেচিত হয়। তার সাক্ষ্যের ওজনও হয় বেশি। পরন্তু যেসব সাক্ষ্যে ঝুঁকি রয়েছে, সেগুলোতে পুরুষরা তুলনামূলক কম আক্রান্ত হয়।

এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে রয়েছে যেখানে নারীর সাক্ষ্যকে পুরুষের সাক্ষ্যের সমান গণ্য করা হয়।[৭৭] অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও নারীর মতামতকে দেওয়া হয় অত্যধিক গুরুত্ব। যেমন, মুসলিমরা দীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় শিখেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যবতী স্ত্রীদের মাধ্যমে। কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো একান্ত নারীদের ব্যাপার; পুরুষরা সে ব্যাপারে সরাসরি অবগত হতে পারেন না। এসব ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদানের অধিকার কেবল নারীদের জন্যই সংরক্ষিত। অনুরূপ পুরুষদের একান্ত ব্যাপারে পুরুষদের সাক্ষ্যই গ্রহণীয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মর্যাদা কম না বেশি তা বিবেচ্য নয়; বরং নির্দিষ্ট বিষয়ে অধিক যোগ্য কে তা-ই বিবেচ্য।

যেমন, নারীরা বাচ্চার যত্নআত্তিতে অধিক যোগ্যতা রাখেন। তাই

ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলোতে পর্যন্ত আদালতগুলোকে দেখা যায় মা-বাবার বিবাহ বিচ্ছেদের পর সন্তানের দেখাশুনার দায়িত্ব মায়ের ওপরই অর্পণ করে (যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। তাই বলে কি আমরা বলবো নাকি এসব বিচারে পুরুষের অধিকার হরণ করা হয় এবং নারীর সঙ্গে সমতা বিধান থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়? অবশ্যই আমরা এমন বলবো না, বরং আমরা বলবো, নিশ্চয় একজন মা শিশু প্রতিপালনে একজন পুরুষের চেয়ে অধিক যোগ্য। ঠিক একইভাবে অনেক বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার বেলায় পুরুষই অধিক উপযুক্ত।

নারীর উত্তরাধিকার কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের অর্ধেক কেন?

পূর্বে যে প্রাকৃতিক বাস্তবতার কথা আলোচিত হয়েছে তা থেকে অগ্রসর হয়ে পরিবারের জীবনোপকরণ সংগ্রহের ভার ন্যস্ত করেছে ইসলাম পুরুষের কাঁধে। পুরুষের স্ত্রী-সন্তান, অক্ষম পিতা-মাতা কিংবা কামাইয়ের অযোগ্য ভাই অথবা দায়িত্ব নেওয়ার কেউ নেই এমন বিবাহিত বোন হোক- সবার রুটি-রুজির দায়িত্ব তার ওপর। পক্ষান্তরে এ সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব নারীর ওপর দেওয়া হয় না। এমনকি তার পিতা-মাতা বা যারা তাকে ছোট থেকে প্রতিপালন করেছেন-

তাদরে কারণে দায়ত্বিও তার ওপর ন্যস্ত করা হয় না।

উদারণতঃ এ জন্যই ইসলাম মুসলমিকে অনুমতি দয়ে না তার সম্পদরে যাকাত আপন স্ত্রী বা সন্তানদরে দতি।ে কনেনা তাকে নজিরে দায়ত্বিরে অংশ হসিবেইে তাদরে প্রয়োজন পুরো করতে হব;ে সদকার অংশ থকেে তাদরে ওপর খরচ করবে কনে। এ কারণে যাকাত কবেল সীমতি কয়কেটি খাতইে ব্যয় করতে হব;ে এর বাইরে কোথাও ব্যয় করা যাবে না। এসব খাত হয়তো হকদার ব্যক্তরি সমস্যা স্থায়ী বা সাময়কিভাবে দূর করবে অথবা উচ্চতর

কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾ [التوبة: ٦٠]

“নিশ্চয় সাদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী,

প্রজ্ঞাময়”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬০]

তাছাড়া নারীরা তাদের সঞ্চিত সম্পদ স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষণ করতে পারবেন- চাই তার মালিক হন বিয়ের আগে কিংবা পরে। উপরন্তু তিনি আপন স্বামীকে তার নিজস্ব সম্পদের তত্ত্বাবধায়কও নিযুক্ত করতে পারবেন। ইসলাম এ জন্য বিবাহপূর্ব ও বিবাহপরবর্তী সময়ে তার স্বতন্ত্র আইনি সত্তা সংরক্ষণেরও নিশ্চয়তা দিয়েছে। সুতরাং বিয়ের আগে মেয়েরা যেমন তার পিতার পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত, বিয়ের পরও তার অবস্থা তেমনি। বিয়ের পর তার গোত্র নামে

কোনো পরিবর্তন আসবে না। যেমনটি প্রচলিত বস্তুগতভাবে সভ্য অনেক সমাজে। সেখানে বিয়ের আগে মেয়েরা গোত্রের নামে পরিচিতি হয় আর বিয়ের পর সমাজ বা আইন তাকে স্বামীর বংশ পরিচয়ে অধিকার দেয়। যেন বিয়ের পর তার মালিকানা পিতার পরিবার থেকে স্বামীর পরিবারে স্থানান্তরিত হয়!

আমরা যদি সূরা আন-নিসা-এর একাদশ আয়াত নিয়ে গবেষণা করি, তাহলে দেখতে পাই পুরুষকে পৈতৃক সম্পত্তিতে বেশি দেওয়া হয়েছে তার কিছু দায়িত্ব ও কল্যাণের সঙ্গে শর্তযুক্ত করে। যখন সরাসরি এ দায়িত্ব চলে যাবে, তখন

অতিরিক্ত অংশটুকুও চলে যাবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ
فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن
كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا
ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ
وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ
ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ
وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ
ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١﴾ [النساء: ١١]

“আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের

দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না।

আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১]

আয়াতে দেখা গেলে একমাত্র মেয়ে তার পিতার অর্ধেকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারীণি হয় আর অবশিষ্ট অর্ধেকে সম্পত্তির অংশীদার হয় নারী-পুরুষ উভয়ে অথবা দুই মেয়ে থাকলে তারা পিতামাতার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশের মালিক হয় আর অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ বণ্টিত হয় নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে। অতএব মীরাছ বা উত্তরাধিকারের অংশ নির্ধারিত হয়

দায়িত্বের স্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আত্মীয়তার স্তর অনুপাতে।

আর সাধারণত এই উত্তরাধিকার সম্পদের মালিকানা লাভের একমাত্র উপায় হয় না। বরং তা একমাত্র উপায় হওয়া সমীচীন নয়, মানুষ যার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। কেননা আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে নারী-পুরুষ দুই শ্রেণিতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের প্রত্যেককে এমনসব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করেছেন, একটি সমাজের জন্য যার কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া তাদের প্রত্যেককে জ্ঞান ও ব্যক্তিগত অর্জনের সুযোগও দান করেছেন। তবে যে ব্যক্তি অক্ষম, তার

ভার অর্পণ করেছেন সমাজের সুস্থ অংশের ওপর। এজন্যই তার সম্পদে ঐ অক্ষম ব্যক্তির জন্য একটি অংশ রেখেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন ফরজকৃত যাকাত। তদুপরি তাদেরকে অতিরিক্ত সদকা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

পক্ষান্তরে পশ্চিমা সমাজে নারী যদি পৈত্রিক সম্পদে সমানাধিকার চায়, তাহলে তা সে তখনই পাবে যখন সে পুরুষের সঙ্গে পরিবারে সমান দায়িত্ব পালন করবে। এর বিনিময়ে তার সম্পদে বিশেষত মানব রচিত আইনে তার তালাকের পর বিচ্ছেদের সময় তার সম্পদ নারী-পুরুষের মধ্যে সমানভাবে

বণ্টিত হয়। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই সম্পদ সঞ্চয়ে অনেক ক্লেশ সহ্য করছে অথবা সে মাত্রই এ সম্পদ অর্জন করছে আর তার স্বামী এ সম্পদ অর্জনে কোনোভাবেই কোনো অবদান রাখেনি।

নারীর বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবক লাগে কেন, আর তালাক কেন পুরুষের হাতে?

অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মতানুসারে নারীর জন্য অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করা বৈধ নয়। কেননা বিয়ের আগে নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করে তার পিতা, ভাই বা পুত্র। যখন তার বিয়ে ব্যর্থ হয়, পুনরায় এ দায়িত্ব নতুনভাবে অভিভাবকদের ওপর এসে বর্তায়। যখন

স্বামী অক্ষম হয় অথবা তার সন্তানদের ব্যয় বহন করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখনও অভিভাবক বাধ্য হয়েই তার সন্তানদের নিরাপত্তা ও লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করে। তাছাড়া কতিপয় ফিকহবিদ কিছু ক্ষেত্রে নারীকে তার অভিভাবক ছাড়া নিজে নিজে বিয়ে করার অনুমতিও দেন।

এদিকে ইসলাম তালাক রেখেছে পুরুষের হাতে। কারণ, নারীকে বিয়ে করার সময় একজন পুরুষকে তার মোহরানা পরিশোধ করতে হয়। পক্ষান্তরে নারীর কিছু প্রদান করতে হয় না পুরুষকে। পুরুষের দায়িত্ব নারীর ঘরকে আসবাব পত্রে সুসজ্জিত করা, নারীর

নয়। তারই দায়িত্ব নারীর মৌলিক প্রয়োজন তথা অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। আরও দায়িত্ব অসুস্থ হলে স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা। তারই জিম্মাদারি নারীর সন্তানের খরচ যোগানো। এমনকি দাম্পত্য জীবনের বিচ্ছেদ ঘটলেও এ দায়িত্ব পুরুষকেই বহন করতে হয়।

এর সঙ্গে আরও বলা যায়, পরিবারে একজন পুরুষের ভূমিকা একটি রাষ্ট্রের প্রধানের মতো। যাকে কিছু গুণের অধিকারী হতে হয়। সে গুণগুলোর মধ্যে রয়েছে, তার দায়িত্বের অংশ হিসেবে পরিবারের অনিষ্টকামীকে শাস্তি

প্রদানের যোগ্যতা রাখা। যেমন, কোনো সভ্য রাষ্ট্রেরই শাস্তির আইন থেকে খালি নয়, যা উপযুক্ত ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ করা হয়। এ জন্যই একটি পরিবারের প্রধান তথা স্বামীর জন্য প্রহারের মতো শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সর্বশেষ স্তর হিসেবে তালাকের চাবুক মারার অনুমতি রাখা হয়েছে। তবে এ শাস্তি হতে হবে এমন যাতে কোনো দাগ সৃষ্টি না হয় এবং পরিবারের সদস্যদের বিশেষত স্ত্রীর ভালোবাসার অন্তরায় না হয়।[৭৮]

পাশাপাশি ইসলাম স্ত্রীকে তার গার্ডিয়ানের কাছে, সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে এবং আদালতে

অভিযোগ করার সুযোগ প্রদান করেছে। স্বামী তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তালাক নেবারও অধিকার দিয়েছে তাকে। অনুরূপ স্বামীর প্রতি কোনো আগ্রহ না থাকলে মোহরানা ফেরত কিংবা স্বামীর খরচাদির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মাধ্যমে তার কাছ থেকে তালাক কিনে নেবারও অবকাশ রেখেছে।

একথা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না যে পুরুষ স্বভাবতই নারীর তুলনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিক সিদ্ধহস্ত। তা ছাড়া বিয়ের খরচ ও সন্তানাদির খোরপোশ, এমনকি তালাকের পরও স্ত্রী ও তার সন্তানের

খরচাদি পুরুষকেই বহন করতে হয় বলে দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রাখতে তারাই বেশি সচেষ্ট থাকে। সর্বোপরি এ বিষয়টাতো আছেই যে ইসলাম তালাককে উৎসাহিত করে না। বরং তালাককে সর্ব চেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ মনে করে।[৭৯]

মুসলিম নারীর জন্য অমুসলিম পুরুষকে বিবাহ করা অবৈধ কেন?

ইসলাম যে নারী-অধিকার রক্ষায় আগ্রহী তার অন্যতম দৃষ্টান্ত এই যে, তা নারীকে এমন স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয় না যার ধর্ম নিজ স্ত্রীর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে বাধ্য করে না। এ কারণে ইসলাম মুসলিম

নারীর জন্য অমুসলিম পুরুষকে বিয়ে করা হারাম ঘোষণা করেছে। তবে মুসলিম পুরুষের জন্য ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান নারীকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ﴾ [المائدة: ٥]

“আজ তোমাদের জন্য বৈধ করা হল সব ভালো বস্তু এবং যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, তাদের খাবার তোমাদের জন্য বৈধ এবং তোমাদের খাবার তাদের জন্য বৈধ। আর মুমিন সচ্চরিত্রা নারী এবং তোমাদের পূর্বে

যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীদের সাথে তোমাদের বিবাহ বৈধ। যখন তোমরা তাদেরকে মোহর দেবে, বিবাহকারী হিসেবে, প্রকাশ্য ব্যভিচারকারী বা গোপনপত্নী গ্রহণকারী হিসেবে নয়...”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৫

আর সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে প্রমাণিত যে মুসলিম-অমুসলিমের বিয়ের অনুমতি কেবল আসমানী কিতাবধারী ধর্মানুসারী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।[৮০] এর অন্তর্নিহিত প্রধান কারণ দু’টি। যথা:

১. ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্মই কেবল ইসলামের মৌলিকতাকে অস্বীকার করে না এবং এ ধর্ম দু’টিই কেবল

কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন আয়াতে ব্যাপকার্থে ‘ইসলাম’ শব্দের মধ্যে পড়ে।[৮১] কেননা, মুসলিম স্বামী ইসলামের শিক্ষানুসারে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টধর্মের নবীসহ পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে বাধ্য। পক্ষান্তরে অমুসলিম স্বামী তার ধর্মের শিক্ষার দাবি অনুসারে ইসলামের নবীর প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে বাধ্য নয়। বরং তার ধর্মের ওপর পূর্ণ বিশ্বাসের অর্থই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মকে অস্বীকার করা।

বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা যায় এভাবে, ইসলাম তার অনুসারীকে পৌত্তলিকি

অথবা নাস্তিক মহিলার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে জড়াবার অনুমতি দেয় না। কেননা তার ধর্ম পৌত্তলিকতা বা নাস্তিক্যবাদকে সমর্থন করে না। এ পটভূমিতে মুসলিম ব্যক্তির স্ত্রী তার অন্যায় আচরণ বা তার অসম্মানের শিকার হতে পারে।

২. স্ত্রীর কিছু অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় ইসলাম। যার মধ্যে রয়েছে স্ত্রীর প্রকৃত মুক্তি ও সমতার অধিকার। স্ত্রীর এ অধিকার প্রদানে একজন মুসলিম স্বামীকে ইসলাম বাধ্য করে। এটি একটি আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম, যাতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে অমুসলিম

স্বামী সে হয়তো নাস্তিক হবে অথবা তা এমন ধর্মাবলম্বী হবে যাতে স্ত্রীর অধিকার প্রদানে বাধ্যকারী বিধি-বিধান নেই। বরং তা নারী অধিকারের ব্যাপারে সেসব আইনের অনুগত যা কেবল অধিকাংশের রায় অনুযায়ী স্বীকৃত। আর অধিকাংশের মতামত যেমন কখনো সঠিক হয় আবার কখনো ভুল। তেমনি তা যুগের পরিবর্তনের সঙ্গেও হয় পরিবর্তিত। যে কেউ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর প্রতি নজর দেবেন যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে আইন পাশ হয়, তাতে অনেক স্ববিরোধিতা ও একের পর এক পরিবর্তন দেখতে পাবেন।

সুতরাং ইসলাম যেহেতু চায় নারীর সম্মান ও অধিকার ভূলুণ্ঠিত নয়; সমুন্নত হোক, আর ইসলাম যেহেতু নারী অধিকার রক্ষায় বদ্ধপরিকর তাই এর নীতি অনুসারে তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে অন্য ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছে।

ইসলাম কেন একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে

ইসলাম পুরুষকে চার চারটি বিয়ের অনুমতি দিয়েছে ঠিক; তবে তা তাদের মধ্যে সাম্য ও ইনসাফ রক্ষার শর্তে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً﴾ [النساء: ٣]

“তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দু’টি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় কর যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি...”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩]

আবার তাদের মধ্যে শতভাগ সমতা রক্ষা যে অসম্ভব সে কথাও বলে দিয়েছেন তিনি। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ ﴾ [النساء: ١٢٩]

“আর তোমরা যতই কামনা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে কখনো পারবে না। সুতরাং তোমরা (একজনের প্রতি)

সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না...”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৯]

পুরুষের এ একাধিক বিয়ের অনুমতিকে অনেক নারীই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন। অথচ বাস্তবে তা নারীর জন্য আল্লাহ তা‘আলার একটি অনুগ্রহ বিশেষ। কারণ:

১. এটা জানা কথা যে পৃথিবীতে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। আবার পুরুষদের চেয়ে নারীদের গড় আয়ুও বেশি। অতএব যদি একজন পুরুষ শুধু একজন নারীকে বিয়ে করে তাহলে অনেক নারীর ভাগ্যেই স্বামী জুটবে না।

২. আল্লাহ তা‘আলার এ বিধান নারীর বিয়ের সুযোগ সংকোচনের পরিবর্তে তার বিয়ে-ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করে। যেমন একজন পুরুষ যদি কেবল এক নারীকেই বিয়ে করে, তবে চারগুণে তার সুযোগ বৃদ্ধি পায় যখন আমরা পুরুষকে চারটি বিয়ের অনুমতি দেই। তাছাড়া সাধারণত এটি একটি সুযোগ মাত্র। যখন প্রয়োজন পড়ে তখনই কেবল এর দ্বারস্থ হতে হয়। ইসলাম তো এ সুযোগ গ্রহণে কাউকে বাধ্য করে না।

৩. আজীবন বিয়ে বঞ্চিত থাকার চেয়ে অন্য নারীর সহযাত্রী হয়ে পুরুষের স্ত্রী হওয়ার মাধ্যমে নানা আর্থিক ও নৈতিক অধিকার লাভ করা এবং

স্বভাবজাত মাতৃত্বের বাসনা পূর্ণ হওয়া তার জন্য শ্রেয়তর। সন্দেহ নেই অবৈধ উপায়ে নিজের জৈবিক চাহিদা মেটানো, আর্থিক ও নৈতিক বিবিধ অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং স্বভাবজাত মাতৃত্বের সাধ অপূর্ণ থেকে যাওয়ার চেয়ে এটি ঢের ভালো। অনেক নারীই নিজের এ আর্থিক ও নৈতিক দায়িত্বের বোঝা বহন করতে পারেন না। আবার এসব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে গিয়ে অনেক নারীর জীবন হয় বিপন্ন। তদুপরি প্রকৃতিবিরুদ্ধ এ অবস্থা পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতনের সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে দেয়। এ ব্যবস্থা প্রায়

ক্ষেত্রেই নারীর জন্য আরও বেশি অপমান ও লাঞ্ছনা বয়ে আনে।

বিবাহিতাদের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক যে তারা একাধিক বিয়েকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন। তারা এমন করেন তাদের সহজাত ঈর্ষা ও হিংসা প্রবণতার কারণে। তবে অনেক বিচক্ষণ নারীও রয়েছেন যারা এ সুযোগকে নেকি অর্জন ও আল্লাহ প্রদত্ত মাতৃত্বের স্বাভাবিক বাসনা পূরণে কাজে লাগান। এ কারণে তারা আপন স্বামীর সঙ্গে অন্যের অংশগ্রহণে আপত্তি করেন না।

ব্যাপারটি অবশ্য এত সোজা নয়। বিশেষত যে সমাজে ইসলামী পর্দার

প্রয়োগ নেই। কেননা, এমন সমাজে প্রায়শই অবিবাহিত মেয়েরা পুরুষকে সম্মোহিত বা প্রবঞ্চিত করে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য করে তার সঙ্গে নিজের বিয়ের রাস্তা পরিষ্কার করে।[৮২] পক্ষান্তরে একাধিক বিয়ে স্ত্রীকে তার স্বামী ধরে রাখার সুযোগ এনে দেয়।

নারীদের কদাচিৎ প্রশ্ন করতে দেখা যায়, ইসলাম কেন নারীকে একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয় না? এটি এমন প্রশ্ন যা হৃদয়ে তখনই প্রথম উদিত হয় যখন একে শ্রেয়তের ভাবা হয়। কিন্তু এতে নারীর কী লাভ? এটা কি তার জন্য সন্তানের প্রতি

দায়িত্ববান পিতার গ্যারান্টি দেবে? কিংবা তা কি তার জন্য সেই পুরুষের নিশ্চয়তা দেবে দুর্যোগ-দুর্বিপাকে যে তার হাত ধরবে কিংবা তার প্রয়োজন ও অসহায় মুহূর্তে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে? বিশেষত যখন সে অসুস্থতা বা বার্ধক্য হেতু অক্ষম হয়ে পড়বে?

এসব প্রশ্নের বাস্তবানুগ উত্তর অবশ্যই না হবে। কেননা, এক নারীর জন্য একাধিক পুরুষ গ্রহণের অনুমতি পুরুষের জন্য যৌন সম্পর্কের কারণে যেসব বোঝা সৃষ্টি হয় সেসব থেকে পলায়ন করার দারুণ সুযোগ করে দেবে। আর তা হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংসের

কারণ। একাধিক স্বামী গ্রহণ নারীর এমন বহুবিধ ক্ষতি বয়ে আনবে একজন বুদ্ধিমতি নারী যা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। খানিক বাদেই ব্যভিচারের দণ্ড সংক্রান্ত হাদীসে এদিকে ইঙ্গিত করা হবে।

মহিলাদের জন্য গাড়ি ড্রাইভ করার অনুমতি নেই কেন?

বক্তব্য ও বাস্তবতায় সুসমন্বিত সঠিক বিচারের রীতি থেকে সামনে বেড়ে এ বিষয়ে আমরা বলবো, ইসলাম নারীকে চালাতে নিষেধও করে না আবার তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধও করে না। সিংহভাগ ক্ষেত্রে বিষয়টি নির্ভর করে নারী যে সমাজে বসবাস করে তার

পরিবেশ-প্রেক্ষাপটের ওপর। কিছু মুসলিম সমাজে নারীরা তাদের ফরজ পর্দার সর্বোচ্চ স্তর রক্ষায় আগ্রহী। অর্থাৎ তারা চেহারা ঢাকা না ঢাকার ইস্যুতে আলেমদের একাধিক মতামতের মধ্যে চেহারা আবৃত করা উত্তম মনে করেন। এ ধরনের পরিবেশে নারীর জন্য গাড়ি ড্রাইভ অনুমোদিত না হওয়ার মতটিই প্রযোজ্য। এমন পরিবেশে নারীর জন্য গাড়ি নিজে ড্রাইভ না করে অন্য কাউকে দিয়ে ড্রাইভ করানোই শ্রেয়। নিজের পরিবর্তে এ কাজে অন্যকে ব্যবহার করাই উত্তম। সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে এটি অধিক মানানসই। কারণ, সবাই চায় যতক্ষণ এ বিশেষত্ব অর্জন

করতে গিয়ে তাকে বেশি অর্থ ব্যয় না করতে হয় ততক্ষণ সে তার একজন ব্যক্তিগত ড্রাইভার বা নিজস্ব ড্রাইভার থাকবে, যে তাকে নিয়ে গাড়ি চালাবে।

মুসলিম রমনী যদি এমন পরিবেশে থাকেন যেখানে অধিকাংশ মহিলা অপর কিছু আলেমের মতানুসারে পর্দার সর্বনিম্ন স্তর রক্ষা করে। অর্থাৎ মাথা আবৃত করে। সম্পূর্ণ সতর ঢেকে শালীন ও পর্দাসম্মত পোশাক পরিধান করে চেহারা অনাবৃত রাখে এবং এটাকে সেখানে কোনো দোষেরও মনে না করে। তাহলে এ ক্ষেত্রে তিনি নিজে ড্রাইভ করতে পারেন। তবে এ সমাজেও

কিন্তু একজন নিজস্ব ড্রাইভার থাকাকেই উত্তম বিবেচনা করে।

হিজাব কেন নারীর জন্য?

সম্ভবত অমুসলিমরা প্রশ্ন তোলেন পর্দা করার দায় কেবল নারীর কেন? আমি অমুসলিমের কথা বললাম এ জন্য যে মুসলিম মাত্রেই তো বিশ্বাস করেন, চেতনা লালন করেন যে, আল্লাহ তা‘আলা যা-ই জরুরী সাব্যস্ত করেন না কেন তাতে তার মঙ্গল নিহিত থাকে। আর এ আদেশ অমান্য করলে তাকে শাস্তি ও আজাবে পতিত হতে হবে। হ্যাঁ, কিছু মুসলিমও বিষয়টিকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন। আসলে বিষয়টির প্রতি বাস্তবসম্মত দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

যাতে কেবল নারীর জন্যই পর্দা বিধানের ইতিবাচক দিকগুলো আমরা অনুধাবন করতে পারি।

ইসলামী পর্দা একজন নারীকে বিশেষ এক মর্যাদা দান করে। যা তার শারীরিক দুর্বলতা ও কোমলতাকে আড়াল করে। পর্দা নারীকে সেসব কষ্ট ও বিড়ম্বনা থেকে বাঁচতে সাহায্য করে বেপর্দা নারীরা যার শিকার হয়। যেমন, এর সর্বনিম্ন স্তর নারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেওয়া এবং তার সম্মানহানীর দুঃসাহস দেখানো। আর এটাই স্বাভাবিক। অপরদিকে এ পর্দা নানা রকমের মানসিক বাধা বা সুরক্ষাপ্রাচীরের মধ্যে অন্যতম।

মানসকি প্রতবিন্ধকরে মধ্যে রয়ছে যমেন, পরচ্ছিন্ন পোশাক, পোশাকরে সুন্দর বন্যাস ও মার্জতি প্রকাশ, আড়ম্বরপূর্ণ জীবনোপকরণ এবং ড্রাইভার, প্রাইভটে সক্রেটোরি বা গার্ড ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় মানুষরে প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। সুরক্ষা দয়ে নানা উটকো ঝামলো ও বড়িম্বনা থকে। এ জন্যই সমাজরে উঁচুশ্রণেীর লোকরো এসব ব্যবহার করনে। নজিরে প্রভাব ও ব্যক্তত্বি প্রকাশে এসবকে কাজে লাগান। সম্ভবত সরকারি ও সামরকি ইউনফিরম হওয়ার পছেনওে অন্যতম কারণ এটা।

আমি মনে করি না এ বাস্তবতাকে কেউ অস্বীকার করবেন। ইসলামের রয়েছে প্রয়োগিক ধর্ম হওয়ার গুণে ঋদ্ধতা। ইসলাম বিলাসদ্রব্যের প্রতি মানুষের সহজাত দুর্বলতাকে অস্বীকার করে না। একে উপেক্ষাও করে না। বরং এ প্রবণতাকে কল্যাণকাজে ব্যবহারে কাজ করে। তবে এ ব্যাপারে বাহুল্য বা বাড়াবাড়িও অপছন্দ করে, যা মানুষকে ভুলিয়ে দেয় যে, ভিত্তিই মুখ্য গুণ। কেননা মৌলিক বা বুনিয়াদি বৈশিষ্ট্যাবলি অর্জনে দরকার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। পক্ষান্তরে বাহ্যিক ও বিলাসী গুণ অনুদান বা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় কিংবা অন্যের থেকে ধারও করা যায়।

এর সঙ্গে যোগ করে বলা যায়, প্রাকৃতিকভাবেই নারী আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক। এমনকি বোরকা পরা অবস্থাতেও। কেউ হয়তো বলবেন, নারীকে এমন মোহনীয় ও চিত্তবিনোদিনী বানানো হলো কেন? তার উত্তরে বলা যায়, এ আকর্ষণের যাবতীয় উপাদান থেকে নারীকে যদি মুক্ত করা হয়, তবে তার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে যারা তাকে ফাও উপভোগ করতে চায় তারা তো বটেই; তার স্বামী পর্যন্ত তার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলবে।

ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা ও বাড়াবাড়ি

জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই জানেন ‘বাড়াবাড়ি’ একটি আপেক্ষিক বিষয়। একজনের কাছে যা বাড়াবাড়ি অন্যজনের দৃষ্টিতে তা হতে পারে ভারসাম্যপূর্ণ। সুতরাং বাড়াবাড়ির মানদণ্ড কী? এমনকি একটি রাষ্ট্রেও এক যুগ থেকে ভিন্ন যুগে প্রবেশের মাধ্যমে বাড়াবাড়ির ব্যাখ্যা বদলে যায়। যেমন এক সময় আমেরিকার উচ্চ আদালত ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ডকে বাড়াবাড়ি হিসেবে গণ্য করে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। পরে এ অবস্থান থেকে সরে এসে আদালত মৃত্যুদণ্ড বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারের আইন সংস্কারে সম্মতি প্রদান করে। তাহলে কি

মৃত্যুদণ্ড প্রথমে বাড়াবাড়ি ছিল তারপর তা স্বাভাবিক হয়ে গেল?[৮৩]

সাধারণত মুসলিমরা যখন শক্ত প্রমাণের আলোকে জানতে পারেন, এসব বিধান আল্লাহর দেওয়া, তখন তারা তাকে সকল মানুষের উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের চেয়ে অধিক কল্যাণকর বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। কেননা আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনিই ভালো জানেন কোনোটি তাদের জন্য কল্যাণকর।

যাবৎ একটি জাতি বা সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক কোনো মুসলিম দেশে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে অর্থাৎ জাতির বিভিন্ন সদস্যের মাঝে

অথবা সে জাতি ও অন্য জাতির মাঝে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে রবের দেওয়া আইন-কানূন ও নিয়মসমূহকে বেছে নেয়, ততক্ষণ সে জাতির কর্ণধার তথা সরকারের দায়িত্ব হবে নাগরিকদের বিশেষ সদস্যবৃন্দ এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে এ শরী'আত বাস্তবায়িত করা। আর পছন্দ মতো আইন নির্বাচনের এ অধিকারের স্বীকৃতি সব স্বাধীন জাতিই দিয়ে থাকে। জাতিসঙ্ঘের সদস্য রাষ্ট্র ও যারা সদস্য নয়- সবাই এ অধিকার প্রদানে একমত। লক্ষণীয় হলো, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি একমাত্র ইসলামী আইন-কানূনই কোনো খন্ডন বা

নির্বাচনকে গ্রহণ করে না। এখানে সবাই সব বিধান মানতে বাধ্য।

ইসলাম কিছু অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারণ করেছে ঠিক যাতে কোনো ছাড় নেই; কিন্তু তাতে স্পষ্টভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার শর্তও জুড়ে দিয়েছে। গভীর তদন্তের মাধ্যমে তা হতে হবে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। তাছাড়া ইসলামই প্রথম এমন শাস্তি নির্ধারণ করেনি। বরং আজ যেসব শাস্তিকে কেউ কেউ বাড়াবাড়ি ও উগ্রতা হিসেবে আখ্যায়িত করছে সেগুলো কিন্তু পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থগুলোতেও ছিল। যেমন ইহুদি ও খ্রিস্টানদের

পবিত্র গ্রন্থ, যদিও কিছু ধর্মহীন ব্যবস্থা এসব শাস্তি প্রয়োগের বিরোধিতা করে থাকে।

সাধারণভাবে লক্ষণীয়, ইসলামী আইনে ‘দণ্ডবিধি’ প্রকৃত অর্থে (প্রতিদান বা প্রতিশোধমূলক) শাস্তি নয়। বরং প্রধানত তা শিক্ষা দেওয়া, সংশোধন করা, প্রতিদান দেওয়া, পরিশুদ্ধ করা ও সমর্থনের একটি উপায়। আর এসবকে নিচের প্রকারগুলোতে শামিল করা যায়:

১. প্রমাণের কঠিন শর্তাবলির সঙ্গে ‘দণ্ডবিধি’ কঠিন ধমক ও ভীতি প্রদর্শনের একটি উপায়। যেমন, ব্যভিচারের দণ্ড, বিশেষত বিবাহিতদের ক্ষেত্রে। এই দণ্ডবিধি প্রতিবিধানের

সংকল্পকারী মানুষকে দুনিয়া-আখিরাতে নিজেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার সুযোগ প্রদান করে। জুহাইনা নামক যে মহিলা সাহাবী নিজে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করেছিলেন এবং তাঁর ওপর দণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল, তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ».

“সে এমন তওবা করেছে যে তা যদি সত্তরজন মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, তবে তা তাদের জন্য

যথেষ্ট হবে। তুমি কি এর চেয়ে আর উত্তম কিছু পাবে যে, সে আল্লাহর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে”।[৮৪]

আর তীব্র ধমকপূর্ণ দণ্ড কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলোতেও চালু আছে। যেমন আমেরিকার কিছু অঙ্গরাজ্যে মহাসড়কে কোনো আবর্জনা ফেললে তার শাস্তি হিসেবে পাঁচশ মার্কিন ডলার জরিমানা করা হয়। যদিও সেই আবর্জনা কেবল একটি খালি ক্যান হয়।

২. এটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অপরাধের ধরণভেদে সংশোধনের একটি উপযুক্ত মাধ্যম।

৩. সুনির্দিষ্ট হকসমূহের ক্ষতিপূরণের এটি একটি উপায়। আবার তাদের এ হক ছেড়ে দেওয়ারও অবকাশ রয়েছে।

৪. এটি অন্তর পরিশুদ্ধকরণ ও পাপ খন্ডনেরও মাধ্যম।

৫. এটি সমাজকে হুমকি ও ভয়াবহ ক্ষতি থেকে বাঁচতে সাহায্য করে এবং তাকে সুরক্ষা দেয়।

কিছু দেশের শরী‘আ বিধান বাস্তবায়নকে উগ্রতা বলে আখ্যায়িত করা হয় কেন?

ইসলামী রাষ্ট্র যেসব ইসলামী আইন প্রয়োগ করে তার কিছুকে ‘উগ্রতা’

বলে কেউ কেউ আখ্যায়িত করে। এসব কিন্তু আর দশটি দেশের মতোই যারা সে দেশের জনগণ বা সংখ্যাগুরু নাগরিকের পছন্দ মতো আইন বাস্তবায়নকে জরুরী মনে করে। আর যখন ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগণ ইসলামকে তাদের বিশ্বাস ও বিধান হিসেবে গ্রহণ করে তখন কিন্তু সে আইনকে ভারসাম্যপূর্ণ বা বাড়াবাড়ি বলা:

১. কোনো মানুষের ধারণাই হতে পারে না, চাই সে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানুক আর না জানুক, চাই এ ব্যক্তি মানুষের স্বাভাবিক মূল্যবোধের মান

রক্ষাকারী হোক কিংবা বল্গাহীনভাবে স্বাধীন হোক।

২. বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডের মুসলিমদের বাস্তবায়নের আলোকেও বলা সম্ভব নয়।

কেননা এর উগ্রতা বা ভারসাম্যতা নির্ণীত হবে আল-কুরআন, রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ ও কুরআন-সুন্নাহ বিষয়ে পারদর্শী মুসলিমদের মধ্যে যারা আলিম তাদের নির্ভরযোগ্য বক্তব্যের আলোকে। আর সমকালীন বিশ্বের সব মুসলিম দেশে যা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ইসলামের প্রাথমিক যুগের আরশিতে দেখলে তাকে বিচ্ছিন্ন গণ্য করা যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ, খেলাফতে রাশেদা এমনকি তার অব্যবহিত পরবর্তী যুগগুলোর সঙ্গেও রয়েছে এর অদূর সম্পর্ক।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সচেতন ইসলামী রাষ্ট্র সমকালের প্রেক্ষাপটে জীবনের বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যা থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব নয়, যাতে উত্তেজনা ও অসহিষ্ণুতা বেশি। যার ফলে একজন মুসলিম তার সকল বিষয়ে এবং সকল অবস্থায় ইসলামের আদর্শ বিধান বাস্তবায়নে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের এবং তার সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের ইসলাম

পালনের স্তর অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রের আসমানী বিধান বাস্তবায়নে তারতম্য দেখা যায়। তবে কোনো অবস্থাতেই আসমানী বিধানকে বাতিল করা বা তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের অবকাশ নেই যতক্ষণ তা অকাট্য বা প্রায় অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় এবং বাস্তবায়নের শর্তাদি উপস্থিত থাকে।

ইসলামী রাষ্ট্র কি মৃত্যুদণ্ড বাতিল করতে পারে?

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي
ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ
فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ
فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿١٧٨﴾ [البقرة:
١٧٨]

“হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর ‘কিসাস’ ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক ‘আযাব”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৭৮]

কোনো বৈধ কারণ ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা অপরাধের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ ٣٢﴾ [المائدة: ٣٢]

“‘এ কারণেই, আমরা বনী ইসরাঈলের ওপর এই হুকুম দিলাম যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল। আর অবশ্যই তাদের নিকট আমার রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ

নিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও এরপর যমীনে তাদের অনেকে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৩২]

অতএব, যখন কোনো ইসলামী রাষ্ট্র মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে তখন তা তার একটি দায়িত্বই পালন করে মাত্র। ইসলামী রাষ্ট্র বা অন্য কোনো রাষ্ট্রের অধিকার নেই একটি জাতি বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যে বিধান পালন করে, তা বাতিল করে দেয়।

ওপরের আয়াতে যেমনটি আমরা লক্ষ্য করলাম, ইসলাম হকদারের হক রক্ষার্থে ক্ষমা করার অধিকার কেবল হকদার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখেছে।

এদিকে ইসলাম তাকে ক্ষমা করতে উদ্বুদ্ধ করছে।[৮৫] আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হত্যাকারী যথেষ্ট শিক্ষা পাবার পর দণ্ড কার্যকরের প্রাক্কালে তাকে ক্ষমা করা হয়।

এটিই কিন্তু ন্যায়সঙ্গত, এমনকি সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও। কেননা রাষ্ট্রের জন্য অধিকাংশ জনগণ বা সকল নাগরিকের পছন্দের বাইরের কোনো আইন বাস্তবায়ন সঙ্গত নয়। আরও জোর দিয়ে বললে, রাষ্ট্রের জন্য কোনো চোর চুরিকৃত পণ্যসহ গ্রেফতার হবার পর সেই দ্রব্যের মালিককে চুরি যাওয়া

সম্পদের মালিকানা ছেড়ে দিতে বাধ্য করার অধিকার নেই।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় অভিযুক্তদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বা তার কিছু নাগরিক কর্তৃক হামলা ঘটানোর অভিযোগের ভিত্তিতেই পুরো একটি দেশকে শায়েস্তা করার অনুমতি দিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ শুধু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যেই। যদিও এ অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে মানুষ নিশ্চিত নয়। এর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কেবল আল্লাহ তাআলাই অবগত।

সুতরাং নিরপরাধ মানুষকে স্বেচ্ছায় হন্তারকের অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড

একটি কার্যকর প্রতিকার। আর বিনা অপরাধে অনেক নিরীহ ব্যক্তি হত্যার শিকার হওয়ার চেয়ে ন্যায়ানুগ বিচার ও যথোপযুক্ত তদন্ত-প্রমাণের পর কঠোর শর্তসাপেক্ষে ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে একজন অপরাধীকে হত্যার এখতিয়ার প্রদান করা অনেক উত্তম, যে অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে খোদ অপরাধী বা তার দল।

আল্লাহ তাআলা এ বাস্তবতাকে সমর্থন করে বলেন,

﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩﴾ [البقرة: ١٧٩]

“আর হে বিবেকসম্পন্নগণ, কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন”’। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৭৯]

অতএব, কিসাস প্রকৃতপক্ষে অনেক নিরপরাধ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করে। অনেক সময় সীমালঙ্ঘনকারী ও অপরাধীরা যুলুম বা সীমালঙ্ঘনবশতঃ যাদের উপর হাত ওঠায়। তেমনি তা অনেককে জীবন দান করে যারা অন্যের হত্যার ক্রোধ প্রকাশে অসংযত। কিসাস তাদেরকে সেই হত্যাকান্ড ঘটানোর পূর্বে শতবার ভাবতে বাধ্য করে যে এর পরিণাম শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডতে গিয়ে দাঁড়াবে।

এ শাস্তির দ্বারা ইসলাম শান্তিপ্রিয় নিরীহ ব্যক্তিদের অবৈধ হত্যার ঝুঁকি ও হুমকি থেকে সাহায্য করে। এ কাজটি পুরোপুরি অধিকাংশ রাষ্ট্রই করে থাকে। এমনকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো পর্যন্ত এ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

তবে ইসলাম নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যার বৈধতা দেয় না। অনুমতি দেয় না অবৈধভাবে শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শনের। যেমন ইসলাম মনে করে অপরাধীদের সহযোগিতা প্রদান কাউকে নিজের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনও কমিয়ে দেয় না। সুতরাং

ইসলাম বিশ্বময় শান্তি রক্ষা ও প্রতিষ্ঠায় একে অন্যকে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة: ٢]

“সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না’। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ০২]

ইসলামী রাষ্ট্র কি চোরের হাত কাটার শাস্তি বাতিল করতে পারে?

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨﴾ [المائدة: ٣٨]

“আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আযাবস্বরূপ এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৩৮]

অতএব, যখন কোনো ইসলামী রাষ্ট্র হাত কাটার দণ্ড কার্যকর করে তখন তা তার একটি দায়িত্বই পালন করে মাত্র। ইসলামী রাষ্ট্র বা অন্য কোনো রাষ্ট্রের অধিকার নেই একটি

জাতি বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যে বিধান পালন করে, তা বাতিল করে দেয়।

ইসলাম মানুষের এবং মুকাল্লাফ সৃষ্টজীবের মৌলিক অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যা তার শান্তি নিশ্চিত করে। তার জীবনকে করে নিরাপদ ও শান্তিময়। যার মধ্যে রয়েছে তার জীবন, সম্পদ ও সম্মান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«أَىُّ يَوْمٍ هَذَا؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى
اسْمِهِ. قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى. قَالَ فَأَىُّ شَهْرٍ
هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ
أَلَيْسَ بِذِى الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ
وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ
هَذَا ، فِى شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِى بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ

الْغَائِبَ ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ».

“এটি কোন দিন? আমরা এই ভেবে চুপ করে রইলাম যে, হয়তো তিনি এদিনের পূর্বের নাম ছাড়া অন্য কোনো নাম দেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, অবশ্যই। তিনি আবার বললেন, এটি কোন্ মাস? আমরা এই ভেবে চুপ রইলাম যে, হয়তো তিনি এর পূর্বের নাম ছাড়া অন্য কোনো নাম দেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা কি যিলহজ মাস নয়? আমরা বললাম, অবশ্যই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের পারস্পরিক সম্মান তোমাদের এই দিন, তোমাদের এই মাস এবং তোমাদের এই শহরের মতই হারাম তথা পবিত্র ও সম্মানিত। উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে এ কথা পৌঁছে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি হয়তো এমন ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেবে যে তার চেয়ে অধিক হেফাযতকারী হবে”।[৮৬]

এ কারণেই এসবের ওপর স্বেচ্ছায় ও সুপরিকল্পিত অন্যায় হস্তক্ষেপ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির যোগ্য করে। যে এসব অন্যায় করেনি তার জন্য

দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। কেননা চোর কখনো তার চৌর্যকর্ম সম্পাদনকালে এর চেয়েও বড় অন্যায় যেমন হত্যাকান্ড পর্যন্ত ঘটাতে উদ্বুদ্ধ হয় তার কর্মকে নির্বিঘ্ন করতে। চৌর্যবৃত্তিও সমাজে ভীতি ছড়িয়ে দেয়। আবার কখনো জীবন বা সম্পদ রক্ষার্থে হত্যার দিকেও নিয়ে যায়।

[ইসলামী রাষ্ট্র কি ব্যাভিচারীর বেত্রাঘাত দণ্ড বাতিল করতে পারে?]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ

بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢﴾ [النور: ٢]

“ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ’টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের আযাব প্রত্যক্ষ করে”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ০২]

অতএব যখন কোনো ইসলামী রাষ্ট্র ব্যভিচারের দণ্ড কার্যকর করে তখন তা তার একটি দায়িত্বই পালন করে মাত্র। কোনো রাষ্ট্রের অধিকার নেই

একটি জাতি বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যে বিধান পালন করে, তা বাতিল করে দেয়।

আমরা যদি অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্কের কুফল বিশ্লেষণ করি, তবে দেখতে পাই যে, তা নানাবিধ জটিল রোগের জন্ম দিচ্ছে এবং সমাজে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করছে। যেমন, গৃহহীন হওয়া, অপরাধচক্রে জড়িয়ে যাওয়া, ভ্রুণ হত্যার অপরাধে লিপ্ত হওয়া, দাম্পত্য কলহ ও পারিবারিক সম্পর্কচ্ছেদের ঘটনা বৃদ্ধি ইত্যাদি। এ জন্যই ইসলাম যৌন সম্পর্ককে শরী'আতের বিবিধ শর্তের বেড়াজালে বেঁধে দিয়েছে, যা মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ করবে ঠিক কিন্তু তার দায়-

দায়িত্ব ও ফলাফল বহনের সঙ্গে। ফলে সমাজের ভারসাম্যে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না আবার অধিকারগুলোও থাকবে সুরক্ষিত। বিশেষত নিরীহ শিশুদের অধিকার, যারা কোনো প্রতিরোধ করতে পারে না। এতে করে মায়ের ওপর সব বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে না। শিশুরা তাদের দেখাশুনা এবং যত্ন করার লোকও পাবে। নারী-পুরুষ উভয়কে নিতে হবে দায়িত্ব। বাস্তবে যেমন দেখা যায়, পুরুষ এমনভাবে চলে যেন কিছুই ঘটেনি। সে তার দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়ায়। তারপর দায়িত্ব যত গিয়ে পড়ে শুধু নারীর কোমল কাঁধে। অতএব যেসব সংগঠন, ঘোষণা ও আইন যৌন সম্পর্ক স্বাধীনতার

প্রতি আহ্বান জানায় তারা মূলত পুরুষ কর্তৃক নারীদের সবচে মন্দ ব্যবহারেরই বৈধতার প্রবক্তা।

এমনকি গর্ভনিরোধক নানা পদ্ধতি অবলম্বনের পরও সমস্যা ভিন্নভাবে উপস্থিত হয়। আর তা হলো, নারীদের সহজাত মাতৃত্বের বাসনা অতৃপ্ত থেকে যায়। পৃথিবীতে মানবজীবনের চলার পথ কণ্টকাকীর্ণ হয় এবং এর ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। এই ভারসাম্যে বিঘ্নেরই অংশ হিসেবে সমাজে বয়োবৃদ্ধের হার বৃদ্ধি পায়। এটি যেকোনো সমাজের জন্যই সামাজিক ও অর্থনৈতিক কুফল বয়ে আনে।

অনুরূপ মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ অবৈধ সম্পর্ক স্বভাব বিরুদ্ধতা হতেই হত্যার মতো অপরাধ সংগঠনের পরিবেশ সৃষ্টি করে। আর নারীর অধিকার ও নিষ্পাপ শিশু, যাদের রয়েছে বাঁচার অধিকার- তাদের হক রক্ষার্থে এবং দায়িত্বহীন পুরুষরা যাতে যৌথ দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বাঁচতে না পারে সেজন্যই ইসলাম জৈবিক সম্পর্ক স্থাপনে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে।

বিবাহিত ব্যাভিচারিণীর প্রস্তরাঘাত দণ্ডের বাস্তবতা কী?

যিনা প্রসঙ্গে আলোচনায় এসে ঐ সমালোচনাগুলোরও পর্যালোচনা করা দরকার যেগুলো বিবাহিত নারী-পুরুষের

যিনার শাস্তি রজম বা প্রস্তরাঘাতকে কেন্দ্র করে উত্থাপন করা হয়ে থাকে। বস্তুত মাসআলাটি মত বিরোধপূর্ণ।

একদল আলেম আছেন যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের অনুকরণে বিবাহিত নারী-পুরুষের প্রস্তরাঘাতদণ্ড বহাল রাখার প্রবক্তা। হাদীসে বর্ণিত সেই প্রস্তরাঘাত দণ্ডের দৃষ্টান্তগুলো হলো মাঈয আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রস্তরাঘাত[৮৭] দণ্ডের ঘটনা, গামেদীয়া মহিলা সাহাবীর প্রস্তরাঘাত[৮৮] দণ্ডের ঘটনা, জুহাইনিয়া মহিলা সাহাবীর প্রস্তরাঘাত[৮৯] দণ্ডের ঘটনা এবং

শুরাহার প্রস্তরাঘাত[৯০] দণ্ডের ঘটনা। পরন্তু এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

“বিবাহিত-বিবাহিতা যদি ব্যভিচার করে তবে একশ বেত্রাঘাত ও প্রস্তরাঘাত করা হবে”।[৯১]

এদিকে প্রস্তরাঘাত দণ্ডের আয়াতের লিখিতরূপ যদিও কুরআন শরীফ থেকে মানসূখ বা রহিত হয়েছে কিন্তু প্রস্তরাঘাত সংক্রান্ত আয়াতটি যে মানসূখ বা রহিত করা হয় নি এ ব্যাপারে উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তি বিদ্যমান।[৯২]

অপরদিকে আরেকদল আলেমের মতে রজম বা প্রস্তরাঘাতের বিধানটি যতটা না মানুষকে সতর্ক ও সংযত করার জন্য তার চেয়ে বেশি ছিল ইসলামের সূচনা যুগে যখন ব্যভিচার খুব ব্যাপকতা লাভ করেছিল এর মাধ্যমে তাদের শাসানো। পরে গিয়ে যা রহিত হয়ে যায়। আর তা বুঝা যায় নিচের প্রমাণগুলো থেকে:

১. ইসলামে ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণের সাক্ষ্যে শর্তগুলোকে অনেক বেশি কঠিন করা হয়েছে। বরং যে ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট শর্ত ছাড়া কারো বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণের অপচেষ্টা চালাবে তাকে

সতর্ক করার জন্য আশিটি বেত্রাঘাতের[৯৩] বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। পাশাপাশি স্বামী অভিযোগ তুললে জনসম্মুখে কসমের মাধ্যমে নিজেকে নির্দোষ দাবি করার সুযোগও দেওয়া হয়েছে স্ত্রীকে।[৯৪]

২. যতগুলো ঘটনায় যিনার হদ বা ব্যভিচারের দণ্ড প্রয়োগ করা হয়েছে ব্যতিক্রমহীনভাবে তার সবগুলোতেই দেখা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হদ প্রয়োগ ঠেকাতে ‘যারপরনাই’ চেষ্টা করেছেন। যেমন, মাঈয আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘটনায় দেখা যায়, মাঈয রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন যিনার

স্বীকারোক্তি দিয়ে বসেন, তিনি তখন চার চারবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তার গোত্রের লোকদেরকে তার জ্ঞান-বুদ্ধির স্বাভাবিকতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং নানা অসুবিধাকর প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করানোর চেষ্টা চালান। তদুপরি তিনি তাঁর সঙ্গীদের বলেন, প্রস্তর নিক্ষেপকালে যখন সে পালাতে চেষ্টা করবে তখন যদি তোমরা তাকে ছেড়ে দিতে। তেমনি অন্তঃসত্তা গামেদীয়া মহিলার ক্ষেত্রেও তিনি বারবার তার শাস্তি ঠেকাতে চেষ্টা করছেন। এমনকি তিনি তাকে গর্ভস্থ বাচ্চা জন্ম দিয়ে তার দুগ্ধপানের

মেয়াদ শেষে অর্থাৎ দুই বছর পরে আসতে বলে ফিরিয়ে দেন।[৯৫]

৩. যিনা বা ব্যভিচার নামক অপরাধ একজনের দ্বারা সম্পাদিত হয় না। এর জন্যে প্রয়োজন হয় দু'ব্যক্তির। তথাপি কোনো অর্থগত বর্ণনাতেও পাওয়া যায় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনোভাবে অপরপক্ষের পিছু নিয়েছেন। শুধু একটি ঘটনা এর ব্যতিক্রম। সে ঘটনায় স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে যিনাকারীর কাছ থেকে অর্থদণ্ড আদায় করেছে। এ মহিলাটি ছিল কুমারী। আর তার বিচার দায়ের

করা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে।[৯৬]

৪. ব্যভিচারী স্ত্রীকে কয়েদ রাখার আয়াত পঠিতরূপে বহাল রেখে তার বিধান রহিত করা[৯৭] থেকে এ কথাই অনুমিত হয় যে পঠিতরূপে প্রস্তরাঘাত দণ্ড রহিত হওয়া বিধান হিসেবে রহিত হওয়ার প্রমাণ।

এছাড়া ইসলামে এ ধরনের অনেক বক্তব্যই রয়েছে যেখানে উদ্দেশ্য কেবল তীব্রভাবে ধমক দেওয়া ও ভীতি প্রদর্শন করা। যেমন হাদীসে সুদখোর, উল্কি অংকনকারী ও এর আবেদনকারী মহিলাকে লানত বা অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে

আল্লাহর রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করা উদ্দেশ্য নয়। বরং তাদের সতর্ক করা উদ্দেশ্য।[৯৮]

তাছাড়া যে কেউ ইসলামের দণ্ডবিধি বিশেষত যিনার অপরাধ নিয়ে চিন্তা করবেন, তিনি দেখবেন আসলে এর সঙ্গে অনেক সামষ্টিক লাভালাভ জড়িত। কেননা যখন কেউ এভাবে রাখঢাক না করে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় যে চার চারজন ব্যক্তি তার চাক্ষুস বিবরণ দিতে পারে তখন সে শুধু ভিকটিমের নিকটাত্মীয়বর্গের মান-সম্মানেই আঘাত করে না, বরং সার্বজনীন রীতিনীতিকেও সে তাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে।

ইসলাম ত্যাগকারী কি হত্যার যোগ্য?

আগেও বলা হয়েছে যে সাধারণ নিয়ম হলো ইসলাম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। তবে কেউ যখন স্বেচ্ছায় নিজ ধর্ম হিসেবে ইসলামকে বেছে নেয়, তখন সে মূলত পুরো পার্থিব জীবনের মেয়াদের জন্য আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। আলেমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিচের বাক্যের জন্য এটিকেই যুক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».

“যে ব্যক্তি তার ধর্ম পরিবর্তন করবে তাকে হত্যা করো”।[৯৯]

এটি আসলে কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণের মতো, যার মধ্য দিয়ে সে ঐ দেশের নিয়ম-কানুন, সৈন্যবাহিনীতে অংশগ্রহণ, কর প্রদান ও সে দেশের রীতি অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডের আদেশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

বলাবাহুল্য যে, চুক্তি বা সন্ধির একটি বাধ্যতামূলক দিক রয়েছে। একবার চুক্তি বা সন্ধি সম্পাদিত হবার পর বিদ্যমান পক্ষগুলোর মধ্য থেকে কেবল একজন সেই চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে না। আর যিনি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটগুলো বিবেচনায় রাখবেন

তিনি দেখবেন, এই বিধানটি এমন সময়ে প্রবর্তিত হয়েছে যখন মানুষের রাজনৈতিক পরিচয় আজকের মতো সুবিন্যস্ত ও সুরক্ষিত ছিল না। যার দ্বারা বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। তৎকালে কেবল ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতেই মানুষের বিভিন্ন দলের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব ছিল।[১০০]

ফলে তখন ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদের জন্য সহজেই গুপ্তচরবৃত্তি করা, ছদ্মবেশ ধরা এবং ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। এ কারণেই

এমন বিধান প্রণয়ন জরুরী হয়ে পড়েছিল।

মানুষের একটি সীমিত দলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয় তাকে যেমন কিছু অধিকার প্রদান করে তেমনি তার ওপর কিছু দায়িত্বও অর্পণ করে। মানুষ যেমন নাগরিকত্বের অপব্যবহার করতে পারে তেমন এ পরিচয়ের অপব্যবহারও করতে পারে। আর অপরাপর জীবন ব্যবস্থার মতো ইসলামও কাউকে তার বিধান নিয়ে তামাশা করা বা তার অপব্যবহারের সুযোগ দিতে চায় না। এ পরিচয়ের অপব্যবহারের সুযোগ আমরা দেখতে পাই সূরা আলে ইমরানের একটি

আয়াতে। আল্লাহ তা‘আলা এতে ইরশাদ করেন,

﴿وَقَالَت طَّآئِفَةٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجۡهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكۡفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٧٢﴾ [ال عمران: ٧٢]

“আর কিতাবীদের একদল বলে, ‘মুমিনদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে, তোমরা তার প্রতি দিনের প্রথমভাগে ঈমান আন, আর শেষ ভাগে তার কুফুরী কর, যাতে তারা ফিরে আসে”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭২]

তাই দেখা গেছে কিছু ইয়াহূদী মুমিনদের ধোঁকা দেওয়া এবং তাদের মাঝে ফিতনা ছড়ানোর অসৎ উদ্দেশ্যে মুসলিমের ভেক ধরে ঘুরে বেড়াতো। এর সঙ্গে যোগ

করে আরও বলা যায়, ইসলাম হলো আসমানী রিসালত বা ঐশী প্রত্যাদেশের সর্বাধুনিক বরং সর্বশেষ সংস্করণ। ফলে ইহুদী বা খ্রিস্টান থেকে মুসলিমে রূপান্তর তো উত্তরণ ও উন্নতি। পক্ষান্তরে মুসলিম থেকে ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান হওয়া অধঃপতন ও উল্টো পথে চলার নামান্তর।

অন্যদিকে আবার মুসলিম ফকিহবিদগণ এই বক্তব্য-বিধান প্রয়োগ নিয়ে মতবিরোধও করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এ বক্তব্য যতটা প্রয়োগের তারচে বেশি ধমকের। তারা এ ব্যাপারে ইসলাম ত্যাগী মহিলার বিধানে মতবিরোধ এবং তাকে তাওবার আহ্বান

জানানোর মেয়াদে মতবিরোধকে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছেন, যদিও তার তওবার গুরুত্বের ব্যাপারে সবাই একমত। যেমন, কেউ এ সম্পর্কে বলেছেন, তাকে তার জীবনাবসান পর্যন্ত তওবার সুযোগ দিতে হবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢١٧﴾ [البقرة: ٢١٧]

“আর যে তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর দীন থেকে ফিরে যাবে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মারা যাবে, বস্তুতঃ এদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট

হয়ে যাবে”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১৭]

এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا»

“নিশ্চয় আমল কবুল করা হবে তার শেষ অবস্থা দেখে”।[১০১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ».

“আল্লাহ তা‘আলা বান্দার তাওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার মৃত্যুর চূড়ান্ত অবস্থা শুরু হয়”।[১০২]

এ ছাড়া হাদীসে এসেছে,

«لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ».

“কোনো মুসলিমকে তিন কারণ ছাড়া হত্যা করা বৈধ নয়: বিবাহিত ব্যভিচারী, তাকে রজম করা হবে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুসলিমকে হত্যা করে। এবং যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রোহ করে। ফলে তাকে হত্যা করা হবে অথবা শূলিতে চড়ানো হবে অথবা দেশান্তরিত করা হবে। অর্থাৎ এ হাদীসে ধর্মত্যাগের

সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধকেও যোগ করা হয়েছে”।[১০৩]

পরিশিষ্ট

ইসলামের কিছু সাধারণ বাস্তবতা রয়েছে, ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও শরী‘আ-আইনের -উপাদান-কাঠামো নিয়ে সমালোচনার যোগ্য হতে হলে যেগুলো না জানলেই নয়। যেমন,

প্রথমত: ইসলাম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অনেক অংশের একটি পূর্ণ একক। এর মধ্যে রয়েছে খালেক বা স্রষ্টার সঙ্গে মাখলুক বা সৃষ্টজীবের পারস্পরিক আচরণ ও

লেনদেনের প্রয়োজনীয় সব নিয়ম-কানুন ও রীতিনীতি। আর দুনিয়ার জীবন যেহেতু আখিরাতের জীবনের ক্ষেত স্বরূপ। দুনিয়াতে আমরা যা চাষাবাদ করবো এখানে তার সামান্যই ভোগ করবো। তাই যে আখিরাতে সিংহভাগ ভোগ করবো তার মূল্যই বেশি। আর যেসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও বক্তব্য এসেছে সেসব নিয়ম-কানুন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে ত্রুটি মুসলিমের চিরস্থায়ী জীবনের গন্তব্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

দ্বিতীয়ত: ইসলাম তার সাধারণ অর্থ অনুযায়ী, অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর প্রতি

সমর্পিত হওয়া- এর পথ পরিক্রমার সূচনা হয়েছে আদম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে। তার পরে অসংখ্য রাসূল এ পথে মানুষকে ডেকেছেন। সর্বশেষে এ পথে মানুষকে আহ্বান করছেন খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতপর আল্লাহ তা'আলা এ আখেরী রিসালত তথা সর্বশেষে প্রত্যাদেশের দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। যে রিসালাত কিয়ামত পর্যন্ত এ পার্থিব জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে। তাই মুসলিমদের জন্য এই রিসালাতকে কেবল নিজেদের মধ্যে সীমিত রাখা সমীচীন নয়। এ সেই ধর্ম

যা জিন্ন-ইনসানের ক্ষণস্থায়ী ও চিরস্থায়ী জগতের সৌভাগ্য ও কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। তবে কোনো মুসলিমের জন্য কাউকে এ ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করার অধিকার দেওয়া হয় না। অতএব এই পরীক্ষার জগতে এবং এ পার্থিব জীবনে কাউকে দীন গ্রহণে জোরজবরদস্তি করা যাবে না।

তৃতীয়ত: ইসলাম একটি রাজনৈতিক ঐক্যের আওতায় বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ করে। তারা সংখ্যাগুরু হোক বা সংখ্যালঘু। অবশ্য তা প্রত্যেক দলের যথাযোগ্য ব্যবধানের নিরিখে। তবে সামষ্টিক পর্যায়ে সংখ্যাগুরুদের

ইসলাম কিছু অধিকার দিয়ে, যেখানে বিভিন্নতার কোনো অবকাশ নেই বলে তা সংখ্যালঘুদেরে দেওয়া সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে ব্যক্তি পর্যায়ে ইবাদাত-বন্দেগী ও নাগরিক অধিকারাদি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বীকৃত সংবিধানের মূলনীতির আলোকে তাদের যথাযোগ্য অধিকার প্রদান করে।

চতুর্থত: আল্লাহ তা‘আলা মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবেই পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করেছেন এবং দুনিয়া-আখিরাতের সাফল্য ও সৌভাগ্য লাভের জন্য একে অপরকে পরস্পরের সহযোগী হতে উদ্বুদ্ধ

করেছেন। এমনকি ইসলাম কবুল না করার মাধ্যমে যারা চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভে সহযোগী হতে অস্বীকৃতি জানায়, অন্তত দুনিয়ার জীবনের সুখ-শান্তি বাস্তবায়নের জন্য হলেও তাদের সহযোগী হতে মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ কারণে ইসলাম সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করতে তাদের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যৌথ ব্যাপারগুলোতে ইতিবাচক সহযোগিতায় অনুপ্রাণিত করে।

পঞ্চমত: সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ ইস্যুতে ইসলামকে হরদম অভিযুক্ত করা হচ্ছে। যা পশ্চিমা দুনিয়ায় ইসলাম

সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভীতি ছড়াচ্ছে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে ভীতি প্রদর্শন, যার সমার্থক হিসেবে টেররিজম (terrorism) বা সন্ত্রাস শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং ইসলাম যাকে সন্ত্রাস বলে চিহ্নিত করে সেই ‘রু‘ব’ (الرعب) শব্দের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তদুপরি লক্ষণীয় হলো শব্দদু’টি ব্যবহারের দু’টি দিক রয়েছে:

১. সর্বাবস্থায় ইসলাম সন্ত্রাস ও আগ্রাসনকে হারাম মনে করে। এবং এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে। অন্যের বিরুদ্ধে যে সন্ত্রাস ও আগ্রাসনের সূচনা

করবে, যে বা যারা তাকে সহযোগিতা করবে এবং যুদ্ধরত পক্ষগুলোর মধ্যে সাম্যভিত্তিক সমাধানকে যে বা যারা অস্বীকার করবে- এরা সবাই এ অপরাধে অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. আক্রান্ত বা মজলুম ব্যক্তি প্রতিরোধ বা আত্মরক্ষামূলক ত্রাস অথবা সহিংসতা অবলম্বন করে। ইসলাম একে শর্তসাপেক্ষে ও প্রয়োজন সীমা পর্যন্ত জরুরী মনে করে। বরং আগ্রাসীকে ঠেকাতে ইসলাম এসব অবলম্বনে উদ্বুদ্ধও করে। বলাবাহুল্য, যুলুম ও অত্যাচার নির্মূলে

গৃহীত যেকোনো পদক্ষেপই এর আওতাভুক্ত।

প্রকৃত অবস্থা ও জাতিসংঘের সনদগুলো পর্যালোচনা করলে এটা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, এই বাস্তবানুগ প্রকারের ক্ষেত্রে উভয়টি ইসলামের সঙ্গে সহমত পোষণ করে। এর দাবী, ত্রাস বা সহিংসতা মোকাবেলায় আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতি গ্রহণে গাফলতি না করা। কেননা এই সাময়িক জীবনে সংঘাত ও দ্বন্দ্বের অমোঘ নিয়মেই দুষ্ট ও শিষ্টের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। আর সন্ত্রাস ও আগ্রাসন কেবল অস্ত্র ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং যালিমের

পক্ষে ভোট দেওয়া বা মযলুমের বিপক্ষে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। আর বিশেষ ধরনের বা অবিনাশী সন্ত্রাস যেমন, তৎক্ষণাৎ অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা, আভ্যন্তরীণ কোন্দল উস্কে দেওয়া, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সুস্থ মূল্যবোধ বিনষ্টকারী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও অনেক ক্ষেত্রে নিরপরাধ মানুষের ধীর মৃত্যু বা দীর্ঘ যন্ত্রণার কারণ হয়। কখনো তা তাদেরকে চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভ থেকেও বঞ্চিত করে। তাই এসবও এক সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বাইরে নয়।

দু’টি বিষয় ভুলে গিয়ে অনেক সময় ইসলামের প্রতিষ্ঠিত কিছু বিধান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়:

১. বিধানটি আল্লাহর পক্ষ থেকে- যখন মুসলিমের কাছে বিষয়টি প্রমাণিত হয়, তখন তার পক্ষে বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না যে তা মানব রচিত যেকোনো বিধানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কেননা আল্লাহ তা‘আলা মানুষের স্রষ্টা। তিনিই ভালো জানেন কোনোটি তাদের উপযুক্ত এবং কোনোটি তাদের জন্য উত্তম। আর পশ্চিমা বিপ্লবকালে মানুষের অনেক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, ইসলামের অনেক বিধানই বেশি

কল্যাণকর, মানবাধিকারের প্রতি অধিক যত্নশীল এবং বিবিধ ও সাংঘার্ষিক অধিকারের মধ্যে সর্বোত্তম ভারসাম্য রক্ষাকারী।

২. জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমগুলোতে সীমাবদ্ধতার কারণেই মানুষের জ্ঞান সীমিত। অতএব মানুষের উচিৎ তাদের স্রষ্টা এবং সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের দুঃসাহস না দেখানো।

হ্যাঁ, আল্লাহ তা‘আলা ইনসানকে যে সুস্থ প্রকৃতি ও অর্জিত জ্ঞান দান করেছেন তার মাধ্যমে মানুষের পক্ষে আসমানী কিছু বিধানের রায-রহস্য জানাও সম্ভব। তবে তাদের এমন দাবী

করা সমীচীন নয় যে তারা সকল আসমানী বিধানের হিকমত-রহস্য জানতে বা পরিপূর্ণভাবে তার বিধানাবলি বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

বিধান প্রণয়নে মানুষের গবেষণা ও আবিষ্কার থেকে যে ঐশী বিধানাবলি অনেক উচ্চে তার সবচে সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখতে পাই আমরা ইসলামে নারীর মর্যাদা এবং মানব রচিত আইনে নারীর মর্যাদার পরস্পর তুলনা করলে। তাই দেখা যায় চৌদ্দশ বছর আগে ইসলাম যেখানে নারীকে গুরুত্বের দিক দিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের সমান মর্যাদা দিয়েছে, মানব রচিত ব্যবস্থাগুলোতে এসবের অনেকে

মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে মাত্র বিগত শতাব্দীতে। তেমনি ইসলাম নারীকে এমন কিছু অধিকার দিয়েছে যা তাকে এখনো দেওয়া হয় না। ইসলাম যেমন নারীকে পরিবারের সব ধরনের আর্থিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

অনেকে ইসলামী রাষ্ট্রের কিছু ধর্মীয় বিধান বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অথচ তারা ভুলে যান:

১. একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের অধিবাসী কিংবা কোনো জাতি বা তাদের অধিকাংশই যদি নিজেদের পরস্পর এবং নিজেদের ও অন্যদের মাঝে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে নির্দিষ্ট

কিছু আইন-কানুন বা বিধানাবলিকে স্বেচ্ছায় নিজেদের জন্য মনোনীত করে, তবে যারা এসব বিধানের সমালোচনাকারী সেই ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে পর্যন্ত এর দাবী হলো তাদের ইচ্ছে ও পছন্দের প্রতি রাষ্ট্রের সম্মান দেখানো।

২. জাতিসঙ্ঘ এ কথার স্বীকৃতি দেয় যে, প্রতিটি জাতির রয়েছে নিজস্ব স্বাধীনতা এবং আপন চলার পথ নির্বাচনের অধিকার। অতএব এ জাতির ইচ্ছার সমালোচনার অর্থ জাতিসঙ্ঘ সনদ লঙ্ঘন করা।

৩. একটি জাতি বা তার অধিকাংশ সদস্যের কোনো ব্যবস্থাকে

নিজেদের জন্য উত্তম বিবেচনা করা (যদিও তার কিছু সদস্যের দৃষ্টিতে তা অন্যায় মনে হয়) আর অন্যায়ভাবে এসব আইন প্রয়োগ করার মধ্যে এবং সংখ্যাগুরুদের তুলনায় সংখ্যালঘুদের বিধানকে স্থানীয় সরকারের অন্যান্য মনে হওয়া আর কোনো দেশের আইন অন্য দেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য বিদ্যমান।

৪. আমরা যদি আমাদের ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত হই, তারপর বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে ইসলামী বিধানগুলো নিয়ে ভেবে দেখি, তাহলে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, ইসলাম একটি সহজাত ও প্রাকৃতিক জীবন

ব্যবস্থা। প্রথম দেখায় যেমন অদ্ভুত মনে হয় বাস্তবে ইসলাম তেমন নয়।

قائمة المراجع بالعربية

(যেসব আরবী বই থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে)

· القرآن الكريم.

· الكتاب المقدس، كتب العهد القديم والعهد الجديد (دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ١٩٦٨).

· ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد (بيروة: مؤسسة الرسالة ١٣٩٩).

· ابن منظور، جمال الدين محمد مكرم، لسان العرب (بيروت: دار صادر ١٩٩٠).

· أبو يوسف، يعقوب ابن إبراهيم، كتاب الخراج (القاهرة).

· أسد، محمد منهاج الإسلام في الحكم، ترجمة منصور محمد ماضي (بيروت: دار العلم للملايين ١٩٦٩م).

· أسماعيل، سعيد، كشف الغيوم عن القضاء والقدر (المدينة المنورة: المؤلف ١٤١٩هـ).

· البستاني، بطرس، محيط المحيط (.........).

· باحارث، عدنان حسن صالح، مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة (جدة: دار المجتمع للنشر والتوزيع ١٤١٥هـ).

· بن حميد، صالح عبد الله، تلبيس مردود (مكة المكرمة: مكتبة المنارة ١٤١٢هـ).

· الجادر، عادل حامد، أثر قوانين الأنتداب البريطاني في إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين (بغداد: مركز الدراسات الفلسطينية، جامعة بغداد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ١٩٩٦).

· الحراني، عبد السلام بن عبد الله بن أبي قاسم بن ةيمية، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٤٠٤هـ (الرياض: مكتبة المعارف ٤٠٤هـ).

· حميد الله، محمد، مجموعت الوثائق السياسيت للعهد النبوي والخلافت الراشدت (بيروت ...١٩٧٩).

· الحنفي، زين الدين ابن نجم، البحر الرائق شرح كبز الدقائق ط٢ (بيروة: دار المعرفة...)

- دار المشرق، المنجد في اللغة (بيروت: دار المشرق ১৯৯৬).
- الدواليبي، محمد معروف، حقوق الإنسان ودعوة الإسلام إلى العناية بها (مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي...).
- دروين، كارل فان، ترجمة محمد مأمون نجا، التجربة الدستورية الكبرى في الولايات المتحدة (القاهرة: دار النهضة العربية ১৯৪৮).
- رابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي، بيان مكة المكرمة (مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي ১৪২২/২০০২).
- رابطة العالم الإسلامي، ندوات علمية في الرياض، والفاتيكان، ومجلس الكنائس العالمي في جنيف، والمجلس الأروبي في ستراسبوغ حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان (مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي).

- الريسوفي، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (هيرندن: فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ١٤٠١هجرية.

- زندوق، محمود حمدي، مشرف ومقدم، حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف، جمهورية مصر العربية ١٤٢٦).

- الشيرازي، ابراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق، المذهب في فقه الإمام الشافعي، (بيروت: دار الفكر...).

- الصاوي، صلاح، تهافت العالمانية في مناظرة نقابة المهندسين بالإسكندرية (القاهرة: الآفاق الدولية للإعلام ١٤١٦).

- صيني، سعيد إسماعيل، الإسلام والحوار بين الحضارات بحث مقدم في ندوة "الحوار بين

الحضارات من أجل التعايش" المنعقد في دمشق بين الفترة بين ١٧-٢٠/٣/٢٠٠٢ م.

- صيني، سعيد إسماعيل، الإسلام والتنشئة السياسية والوقاية من العنف والتطرف، بحث مقدم للمؤتمر الثاني حول دور العلوم الاجتماعية والصحية في تنمية المجتمع المنعقد في الكويت بين -٢٠/٥/٢٠٠٦ م.

- صيني، الخطاب الإسلامي بين الخطاب الإسلامي بين الرفض و التسليم، مقدم للمؤتمر السنوي الثامن لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في الفترة بين ٩-٣ذي الحجة ١٤٢٧ للهجرة.

- صيني، سعيد إسماعيل، الإنسان والقضاء والقدر، في مجلة الحكمة العدد: ٦٦، جمادي الثاني ١٤٢٧للهجرية ص ٤٢٦-٤٣٧.

- صيني، سعيد إسماعيل، حرية الةعبير والإلحاد والانحلال، مقدم لمؤةمر الإعلام

المعاصر بين حرية الةعبير والإساءة إلى الدين، المنعقد في صنعاء بين ১৪-১২ صفر ১৪৩০ه للهجرية.

- صيني، سعيد إسماعيل، الأمن الفكري و الأنظمة مقدم إلى المؤةمر الوطني الأول للأمن الفكري: المفاهيم والةحدياة المنعقد في الرياض بين ২৫-২৩ جمادي الأولى ১৪৩০ه للهجرية.

- عيد الكافي، إسماعيل عبد الفتاح، حقوق المرأة في الإسلام (مكة: رابطة العالم الإسلامي৭).

- عرفة، محمد عبد الله بن سليمان، حقوق المرأة في الإسلام (القاهرة: مطبعة المدني ১৩৯৮).

- العقاد، عباس محمود، عبقرية عمر (القاهرة: دار الهلال).

- العناني، حنان عبد الحميد، تربية الطفل في الإسلام (عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع ১৪২১).

- العوا، محمد سليم، في النظام السياسي للدعوة الإسلامية ط৭ (القاهرة: دار الشروق ১৯৮৯) ط১ ১৯৭৫.

- القاسم، عبد الرحمن، الحوار مع أتباع الأديان الأخرى (مكة: رابطة العالم الإسلامي ১৪২৬ للهجرية).

- محيسن، محمد محمد محمد سالم، حقوق الإنسان في الإسلام (المؤلف ১৪১২ للهجرية).

- المساري، محمد العربي، الاعتذار عن الماشي كصيغة لتوطيد التعايش والحوار، مقدم في الندوة الدولية بعنوان " الحوار بين الحضارات من أجل التعايش" المنعقد في دمشق في الفترة

بين ١٧-٢٠ مايو ٢٠٠٠ بإشراف منظمة إيسيسكو ووزارة التربية السورية.

· مسلم، أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية (١٩٦٨).

· المقدسي، عبد بن قدامة أبو محمد، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل (بيروت: المكتب الإسلامي ...).

· الميداني، عبد الرحمن حبنكة، أجوبة الأسئلة التشكيكية الموجهة من قبل إحدى المؤسسات التبشيرية العاملة تحت تنظيم الآباء البيض (مكة المكرمة: مكبتة المنارة ١٤١٥).

· الناصر، محمد حامد، خولة عبد القادر درويش، تربية الأطفال في رحاب الإسلام في

البيئة و الروضة (جدة: مكتبة السوادي للتوزيع ١٤١٥ للهجرية).

· هارون، عبد السلام، تهذيب سيرة ابن هشام ط ٥ (الكويت: دار البحوث العلمية ١٩٧٧).

যেসব বিদেশি গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে

· The Arab American News ২৬ January ১৯৯৬.

· Bulletin, Bureau of Justice Statistics, Department of Justice, USA, Feb. ১৯৯৬.

· Ismaeel, Saeed, Fate: Al-Qaaaskdada Wal Qadar, Toronto,

Canada: Al-Attique Publishers, Inc. २०००.

· Jeffries, N., Palestine: The Reality, London: Longmans १९८८.

· Naik, Zakir abdul Karim, Answers to Non-Muslims Common Questions about Islam, Islamic Research Foundation wwwirf.net.

· Shanker, Thom and David E. Sanger, White House Wants to Bury Pact Banning Tests of Nuclear Arms, New York Times July ७,२००१.

· Sieny, Saeed I., Creation of Man and Fate, a paper presented to the Conference on Cultures and

Philosophies at St. Petersburg, S.S.ﷻ. between ৭-১২ September ২০০২.

· Sieny, Saeed I., Muslim and non-Muslim Relations, Medina: Darul Fajr Bookstore ২০০৫.

এই গ্রন্থে আকীদা, ইবাদত, আইন, মানবাধিকার, ইসলাম-প্রচার, উগ্রবাদ-চরমপন্থা ও নারীর মর্যাদা-অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে ইসলামের অবস্থান এবং উগ্রবাদের অর্থ ও ইসলামী শরী‘আকে কেন্দ্র করে উত্থাপিত ইসলামের নানা সমালোচনার যুক্তিপূর্ণ জবাব প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি যৌক্তিক উপায়ে ইসলামের সামষ্টিক

বিষয়সমূহের পরিচয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

[১] সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪০।

[২] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৫; সহীহ মুসলিম: ঈমান অধ্যায়।

[৩] সহীহ মুসলিম: ঈমান অধ্যায়।

[৪] আল-কাসেম, পৃ. ২৩৩-২৭৩।

[৫] এরা হলো, সেই মাখলূকাত বা সৃষ্টি, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ভালো-মন্দ নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছেন, নবী-রাসূলদের মাধ্যমে

তাদেরকে হিদায়েতের পথে যুগিয়েছেন এবং তাদেরকে এই হিদায়াত আত্মস্থ করা ও তদনুযায়ী আমল করার ক্ষমতা দান করেছেন। এরা মানুষ ও জিন। বিস্তারিত দেখুন: ইসমাঈল, কাশফুল গুয়ুম আনিল-কাযা।

[৬] নাহবী, শূরা: পৃ. ৪৩৮।

[৭] মুসনাদ শাফেঈ: ১/২২৪।

[৮] আবূ ইউসুফ: পৃ. ১২৯-১৩০।

[৯] দেখুন, আল-কাসিমি: পৃ. ১৯৭-২০৪।

[১০] দেখুন, আবূ যুহরা, পৃ. ২১৮-৩০৫; ইয়াকুব, পৃ. ১২৮-২৩৭; রাইসূনী লিল-ইসতিহসান, পৃ. ৮০-৯০।

[১১] কিয়াস বলা হয় হুকুমবিহীন একটি ফিকহী মাসআলাকে একই ‘ইল্লত’ বা কারণ বিশিষ্ট কুরআন-সুন্নাহতে হুকুম আছে এমন একটি ফিকহী মাসআলার সঙ্গে তুলনা করা।

[১২] ইসতিহসান বলা হয় একটি মাসআলাকে সদুদ্দেশ্যে তার অনুরূপ বিধানের সদৃশ্য বিধান দেওয়া থেকে বেরিয়ে আসাকে, যা কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়।

[১৩] উরফ বলা হয় মানুষ যে লেনদেন করে এবং যাতে তারা অভ্যস্ত।

[১৪] মাসালেহ মুরসালা বলা হয় মানুষের মাঝে প্রচলিত কল্যাণকে, যে ব্যাপারে কুরআন-হাদীস কিছু বলে না।

[১৫] সাদ্দে যারায়ে বলা হয় ওই উপায়টি হারাম ঘোষণা করা যা সাধারণত হারামে লিপ্ত করে।

[১৬] ইসতিসহাব বিষয়টি আসলে শরীয়তের নতুন কোনো রীতিতে পৌঁছার জন্য নয়; এর উদ্দেশ্য বরং বাস্তবতাকে নির্ণয় করা। যেমন, যখন আমাদের কাছে এর প্রমাণ থাকে যে অমুক ব্যক্তি অমুক মেয়েকে বিয়ে করেছে, তখন আমরা তাদেরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই বিবেচনা করে যাবো,

যাবৎ না এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে এদেরে মধ্যে তালাকরে ঘটনা ঘটছে।

[১৭] সহীহ বুখারী, সৃষ্টরি শুরু অধ্যায়।

[১৮] দেখুন সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৩০; সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭২।

[১৯] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৫৯।

[২০] সূরা আন-নসিা, আয়াত: ০১।

[২১] আহমাদ, হাদীস নং ৬৩৫৩২।

[২২] সূরা আত-তীন, আয়াত: ০৪।

[২৩] আল-মুহাইসনি নাসরি ওয়া দারবীশ, পৃ. ৩৯৯; চীনী, আল-ইসলাম ওয়াত-তানশয়িা সয়িাসয়্িযা।

[২৪] ইসমাঈল, কাশফুল গুয়ুম: ৬৩-৭১ পৃ.।

[২৫] ইসমাঈল, কাশফুল গুয়ুম: ৫৫-৫৬ পৃ.।

[২৬] চীনী, বাক স্বাধীনতা।

[২৭] পবিত্র গ্রন্থ, দ্বিতীয় সফর: ২০; দ্বিতীয় সামুয়েল: ১২/১৮-১৯; বাদশাহদের সফর: ৩/১১; আইয়ুব: ১৯/১৪-১৬।

[২৮] ইবন তাইমিয়া, মাজমু: ৩২/৮৯।

[২৯] মুহাম্মদ: ৪; ইবন তাইমিয়া, মাজমু: ৩১/৩৮০-৩৮২; ইবনুল কাইয়্যিমে, যাদুল মা‘আদ: ৫/৬৫-৬৬।

[৩০] সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ১৩]

[৩১] মুনীব কর্তৃক দাসকে আযাদ করা হল ওয়ালা। এজন্যই আযাদকৃত দাসকে বলা হয় মাওলা।

[৩২] মুহাম্মাদ কুতুব, শুবহাত: ৩৩-৩৫।

[৩৩] সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৩; আল-বায়ানুনী ওয়া খাতরি: ২/৪৬৮৪৭০, ৪/২৯৫-২৯৬; মুহাম্মাদ কুতুব; শুবহাত: ৩৬-৩৮।

[৩৪] সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৮৯; সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত: ৩-৪।

[৩৫] আসাদ, পৃ: ৫৩-৫৬; আল-আওয়াস: ৬৬-৬৮।

[৩৬] ইবন হিশাম: ২/১০৭-১০৮; হুমাইদুল্লাহ, পৃ. ৩৯-৪৭; আল-আওয়াস: ৫০-৬৪।

[৩৭] কর্তৃত্ববানরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চাই দক্ষ হোন বা না হোন; চাই তারা সে ব্যাপারে অভিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ নেন বা না নেন। সুতরাং এখানে কর্তৃত্বের মানদণ্ড হলো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা। আর তা হলো সংখ্যাগরিষ্ট ভোটারদের ভোট পাবার যোগ্যতা।

[৩৮] ইবন হিশাম: ২/১০৭-১০৮।

[৩৯] চীনী, আল-আমনুল ফকিরী ওয়াল-আনযমিা।

[৪০] ইমাম আবূ ইউসুফ, পৃ. ১২৯-১৩০; চীনী, হাকীকা, পৃ. ৬৪।

[৪১] আবূ দাউদ, খারাজ অধ্যায়; আসকালানী: ১২/২৭০-২৭২।

[৪২] নায়কে পৃ, ১৪।

[৪৩] মসিারী, আল-ইতযিার আনলি মাযী।

[৪৪] চীনী, হাকীকাতুল আলাকা, পৃ. ১১১-১১৪।

[৪৫] চীনী, আল-ইসলাম ওয়াল-হওিয়ার।

[৪৬] জাতিসংঘ সনদ, প্রথম অধ্যায়, প্রথম বিষয়, ২য় অনুচ্ছেদ; দ্বিতীয় বিষয়, নং ৭।

[৪৭] চীনী, আলাকাতুল মুসলিমি, পৃ. ৬৪-৬৫।

[৪৮] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮, ১১৬; সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৩।

[৪৯] আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ, ধারা: ৩/২৬; সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত বিশেষ আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ: ৩/১৩।

[৫০] জাতিসংঘ সনদ, প্রথম অধ্যায়, প্রথম বিষয়, ২য় অনুচ্ছেদ।

[৫১] জাতিসংঘ সনদ, প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় বিষয়, ৭ম অনুচ্ছেদে। কারণ, এটি ওই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে, যারা অন্য রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ রচনা করছে।

[৫২] রাবেতা আলমে ইসলামী, ফিকহ বোর্ড, মক্কা ঘোষণা।

[৫৩] ইমাম মালেক রহ, মুয়াত্তা, কিতাবুল জামে'।

[৫৪] দেখুন, সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৩৪; সূরা আল-নাহল, আয়াত: ৫১; সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৯০; সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৩২; সূরা আল-হাদীদ,

আয়াত: ২৭; সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১৩।

[৫৫] দেখুন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫১; সূরা আনফাল, আয়াত: ১২; সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২৬; সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২।

[৫৬] ইবন মানযুর, আল-বুসতানী।

[৫৭] যিনিই আরবী ‘জিহাদ’ শব্দ ও এর ধাতুমূল নিয়ে চিন্তা করবেন, দেখবেন তাতে পূর্বে সংঘটিত কোনো কিছুর প্রতিরোধ অর্থ জড়িয়ে আছে। কোনো হামলার সূচনার অর্থ নেই তাতে। যেমন, দেখতে পারেন, ইবনুল কাইয়্যিমে: ৩/৫-৯।

[৫৮] সহীহ মুসলিম।

[৫৯] ইবন কুদামা মুকাদ্দিসী; ইবন তাইমিয়া হাররানী; আশ-শিরাজী; আল-হানাফী।

[৬০] মুসনাদ শাফেঈ: ১/২২৪।

[৬১] পবিত্র গ্রন্থ, পুরাতন সমাচার: ৭/১-২; দ্বিতীয় ভ্রমণ: ২০/১০-১৮।

[৬২] পবিত্র গ্রন্থ, পুরাতন সমাচার, আ‘দাদ: ১৩/১৭-১৮।

[৬৩] পবিত্র গ্রন্থ, নতুন সমাচার, লুক: ১৯/২৬-২৭।

[৬৪] সহীহ বুখারী, হায়েয অধ্যায়।

[৬৫] তিরমিযী, পবিত্রতা অধ্যায়।

[৬৬] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৩৬।

[৬৭] সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১২১।

[৬৮] যেমন, দেখুন: সহীহ বুখারী, আদব অধ্যায়।

[৬৯] তিরমিযী, পবিত্রতা অধ্যায়।

[৭০] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৩৪।

[৭১] তিরমিযী, সদাচার ও সুসম্পর্ক অধ্যায়।

[৭২] তিরমিযী, মানাকেব অধ্যায়।

[৭৩] দুয়ালিবী, মানবাধিকার, পৃ. ৪-৫; আরও দেখুন, ১৭৮৭ সালে প্রকাশিত আমেরিকার সংবিধান। আমেরিকায় ১৯২০ সাল পর্যন্ত কেবল শ্বেতাঙ্গ

স্বাধীনরাই নাগরিকত্ব পেতে এবং নারীকে কোনো সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হতো না। দেখুন, ডারইউন, সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা।

[৭৪] এ কথার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মন্তব্যকে। যখন তাঁর কাছে বলা হয় যে পারসিকরা তাদের নেতা নির্বাচন করেছে একজন নারীকে, তখন তিনি বলেন, (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً) “সেই জাতি কখনো সফল হতে পারবে না, যারা তাদের নেতৃত্ব অর্পণ করে নারীর ওপর।” (সহীহ বুখারী, মাগাযী অধ্যায়)। অনেকে এই হাদীসের

টিকায় বলেছেন, এর উদ্দেশ্য নারী নেতৃত্ব হারাম ঘোষণা করা নয়। বরং পারস্যে যা ঘটতে যাচ্ছে তার ভবিষ্যৎবাণী করা। উল্লেখ্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যৎবাণী প্রতিফলিত হয়েছিল।

[৭৫] সহীহ বুখারী, জুমু‘আ আধ্যায়।

[৭৬] ইবনুল কাইয়্যেম, যাদুল মা‘আদ: ৩/২৯৫।

[৭৭] যেমন, স্বামী তার স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে তা প্রমাণে চারবার কসম করবে। অনুরূপ স্ত্রীও অপবাদ থেকে আত্মরক্ষায় চারবার

কসম করবে। দেখুন সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬-৯।

[৭৮] চীনী, আল-খিতাবুল ইসলামী।

[৭৯] আবূ দাউদ, তালাক অধ্যায়।

[৮০] চীনী, আল-খিতাবুল ইসলামী।

[৮১] যেমন, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৮, ১৩২-১৩৩; সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৬৭; সূরা ইউনুস, আয়াত: ৭, ৯০।

[৮২] স্ত্রীকে শুধু তালাক দেওয়া কেনে পরকীয়ার টানে নিজ স্ত্রীকে হত্যা, অন্যের স্বামীকে বাগিয়ে নিতে রাক্ষুসী হয়ে নারী হয়ে নারীর জীবন কেড়ে

নওয়ার ঘটনাও তো সমাজে বিরল নয়। -অনুবাদক।

[৮৩] US Department of Justice.

[৮৪] তিরমিযী, হুদূদ অধ্যায়।

[৮৫] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৭৮।

[৮৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭।

[৮৭] ইবন মাজাহ, হুদূদ; আহমদ, বাকউিল আনসার।

[৮৮] আহমদ, বাকউিল আনসার।

[৮৯] আহমদ, আল-বাসরয়্যিীন।

[৯০] আহমদ, আশারা মুবাশ্শারা জান্নাতী অধ্যায়।

[৯১] সহীহ মুসলিম, হুদূদ।

[৯২] সহীহ বুখারী, হুদূদ অধ্যায়।

[৯৩] সূরা আন-নূর, আয়াত: ০৪।

[৯৪] সূরা আন-নূর, আয়াত: ০৬-০৮।

[৯৫] আহমদ, বাকিউল আনসার।

[৯৬] সহীহ বুখারী, আপোস-মীমাংসার অধ্যায়।

[৯৭] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৫।

[৯৮] যেমন, সহীহ বুখারী, ব্যবসায়-বাণিজ্য অধ্যায়; চীনী, হাকীকত, পৃ২৪-২৫।

[৯৯] সহীহ বুখারী, জিহাদ অধ্যায়।

[১০০] এটা সুবিদিত যে, মদীনায় একটি বহু জাতি-ধর্মের সাংবিধানিক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। তবে সে রাষ্ট্র বর্তমানের মতো সুনির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্ত ছিল না।

[১০১] সহীহ বুখারী, রিকাক অধ্যায়।

[১০২] আহমদ, অধিক বর্ণনাকারী সাহাবীদের হাদীস অধ্যায়।

[১০৩] নাসায়ী: রক্ত হারাম অধ্যায়।